

বৌদ্ধ সাহিত্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা



ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
এম, বি, বি, এস;এফ, সি, পি, এস।



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

বৌদ্ধ সাহিত্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা



ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া

এম. বি. এস; এফ. সি. পি. এস।

Boudha Sahitye Chikitsa Byabasta

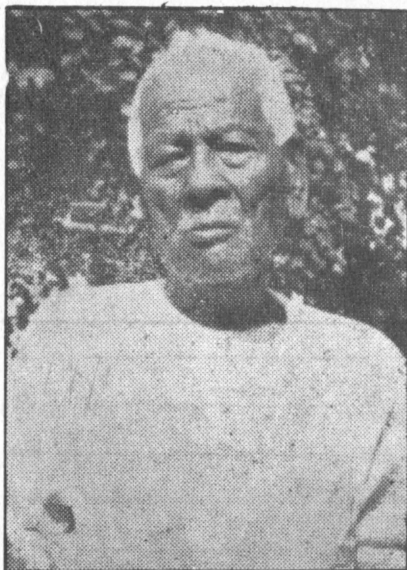
Dr. Sitangshu Bikash Barua

প্রকাশক	✽	শ্রীমতি রোমেলী বড়ুয়া এম, এ; বি, এড;
প্রথম প্রকাশ	✽	শ্রাবণ ১৪০১ বাংলা জুলাই ১৯৯৫ ইংরেজী
প্রচ্ছদ	✽	জনৈক অসুস্থ ভিক্ষুকে বুদ্ধ কর্তৃক সেবা প্রদান।
কম্পিউটার কম্পোজ	✽	‘অক্ষর’ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ২২৭০১৬
মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে	✽	রোজ প্রেস (রোমান গোমেজ) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ২২৭০১৬
প্রাপ্তি স্থান	✽	নীলিমা ভবন, রাউজান, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া ৬৯৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির প্রজ্ঞাবংশ বিদর্শন সাধনাকেন্দ্র শাকপুরা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
মূল্য	✽	২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

সূচী পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রারম্ভিকা	১
কায়গতাস্থিতি	৭
অন্যতঃপশ্চিম সহিত রোগসম্পর্ক	২১
দ্রুতগত	২৫
নিরিমানন্দ সুখ	২৬
জীবকের জীবন ব্যাপ্তি	৩৯
নির্ঘণ্ট	৪২
সহায়ক প্রচাবলী	৪৪

উৎসর্গ



প্রবীণ শিক্ষাব্রতী বিশিষ্ট সমাজসেবী
স্বর্গীয় তিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া
(১৮৯৫-১৯৮০)



নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া'র পত্নী সদ্ধর্মপরায়াণী
স্বর্গীয়া তীলিমা বড়ুয়া
(১৯০৯-১৯৫৫)

ডাঃ জিতাংশু তিকাশ বড়ুয়া

বৌদ্ধ সাহিত্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা

প্রারম্ভিকা

প্রজ্ঞাবংশ বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র, শাকপুরা বোয়ালখালী থানায় একটা দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে বৌদ্ধ ধর্মে ও সাহিত্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখার জন্য আমাকে আহ্বান করা হয়েছে। এই ভাবনা কেন্দ্রে যোগী ও রোগী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কিভাবে শুরু করব, তাহা নির্ণয় করতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে।

বৌদ্ধেরা কর্মবাদী। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের জন্মান্তরবাদ এবং কর্মবাদ বৌদ্ধ ধর্মে স্বীকৃত হলেও বৌদ্ধ দর্শনের সহিত এই দুই বিষয়ে ভারতীয় প্রাচীন দর্শনের পার্থক্য সম্যকভাবে উপলব্ধির অনুপস্থিতিতে অনেকে বৌদ্ধধর্মকে হিন্দু ধর্মের সমপর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে ষিখাবোধ করেন না। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি আত্মবাদ দর্শনকে বৌদ্ধ ধর্মে ও দর্শনে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে অনাত্মবাদ দর্শন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম মতে-“নেতং মম, নে মোহমস্মি ন মে সো অন্তা”। “ইহা আমার নহে, ইহাতে আমি অবস্থিত নহি; ইহা আমার আত্মা নহে।” এখানে আমি নামক ব্যক্তিটি আমার নহে, এই ব্যক্তিটিতে আমার অবস্থিতি নাই, ব্যক্তিটি আমার আত্মা নহে। বৌদ্ধ দর্শনে এই সত্যটিকে বলা হয় পরমার্থ সত্য।

এই পর্যায়ে আমরা বৌদ্ধ দর্শনের মূল বিষয় অবতারণা করতে পারি। বৌদ্ধ দর্শনে সত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার জন্য সত্যকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- (১) সম্মতি সত্য বা লৌকীয় সত্য ও (২) পরমার্থ সত্য। আমাদের চতুর্পাশ্বে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, নারী-পুরুষ, পশু-পক্ষী, গাছ-গাছরা প্রভৃতি যে সকল বস্তু দর্শন করতেছি, সে সকল বস্তুর অবস্থিতি আমাদের নিকট বাস্তব সত্য হিসাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শন মতে আমাদের পক্ষেদ্রিয় গ্রাহ্য এই সকল বস্তুর অবস্থান প্রতীত্য সমুৎপন্ন অর্থাৎ কার্যকারণ সম্মত। হেতু প্রত্যয়ের অর্থাৎ কার্য কারণের অভাবে এই সকল বস্তুর বিদ্যমানতা নেই। অর্থাৎ সকল বস্তুর অবস্থান কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল। এই কার্যকারণের ফলে সম্মত সকল বস্তুর বাস্তব সত্যটা বৌদ্ধ দর্শনে সম্মতি সত্য বা ব্যবহারিক সত্য বা লৌকীয় সত্যের প্যাঁতে পড়ে। কিন্তু পরমার্থ সত্য অন্য কিছু উপর নির্ভরশীল নহে, ইহা অনন্য সাপেক্ষ। সুতরাং পরমার্থ সত্য হিসাবে ব্যক্তি বা আত্মার কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ব্যক্তির অস্তিত্ব বাস্তব সত্য।

এই বাস্তব সত্য বা বস্তু হিসাবে ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্মত সত্য। পরমার্থ সত্য মতে আমি নামক ব্যক্তি পঞ্চ স্বকোপাদানের সমন্বয় মাত্র। এই পঞ্চ স্বকোপাদানকে সংক্ষেপে আমরা নামরূপ বলে থাকি। এই নামরূপ কর্মের অধীন। অভিন্ধ প্রত্যবেক্ষণ পাঠে আমরা দেখি-“কস্মস্ কোমহি, কস্মদায়াদো, কস্মযোনি, কস্মবন্ধু, কস্মপটিসরণো, যং কস্মং করিস্মামি কল্যাণং বা পাপকং বা দায়াদো ভবিসস্মামি।” আমি স্বীয় কর্মের অধীন। আমি কর্মের দায়াদ বা উত্তরাধিকারী, কর্ম আমার (সুখ-দুঃখ প্রদানের) উৎস, কর্ম বন্ধু, আমার সকল সুখ-দুঃখ কর্মশ্রিত। আমি কল্যাণ বা পাপ যে কোন কর্ম করি না কেন সেই কর্মের আমি দায়াদ বা ফল ভোগী হব। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বৌদ্ধ দর্শনের কর্মবাদ ও হিন্দু ধর্মের কর্মবাদ সমপয়্যা ভুক্ত নহে। কারণ হিন্দু ধর্মের কর্মফল অথবা মানুষের ভাল-মন্দের জন্য সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব সর্বাংশে দায়ী এবং মানুষের সুখ-দুঃখ সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর করে। কিছু কিছু প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তি তার নিজের ভাল মন্দের জন্য দায়ী, তবে সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং বিচারক সেজে ব্যক্তির কর্ম অনুযায়ী পুরস্কৃত করবেন অথবা শাস্তি বিধান করবেন। কারণ সৃষ্টিকর্তাই কর্মের বিচার করবেন। তাহাছাড়া পৌরুষবাদী, যোগবাশিষ্ঠবাদী, চরক সংহিতা প্রভৃতি দর্শনে কর্মবাদ স্বীকার করে নিলেও কর্মকে আত্মার সহিত সম্পৃক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে কর্মবাদ স্বীকার করে অনাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাহা নহে বৌদ্ধ দর্শনে আরও বলা হয়েছে-

কস্মস্ কারকো নথি, বিপাকস্ বেদকো,

সুদ্ধ ধম্মা পবত্তন্তি এবে তং সম্মাদসনং।

বাংলা-কর্মের কারক নাই, বিপাকের ভোক্তা নাই,

শুধু চিন্তা চৈতন্যিক ধর্মসমূহ প্রবর্তিত হচ্ছে। ইহাই হল বিশুদ্ধ দর্শন।

‘সুদ্ধধম্মা পবত্তন্তি’ বলতে কেবল চিন্তা চৈতন্যিক ধর্মসমূহ প্রবর্তিত হচ্ছে বুঝায়। আরও ব্যাপকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে বুঝায় প্রতীত্যসমুপাত বা কার্যকারণ নীতিতে যাহা কিছু সংস্কৃত তাহাই আবর্তিত হচ্ছে।

কার্যকারণের ফলে সঙ্ঘটন বস্তুটি শুধু হেতু ও প্রত্যয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মসমূহে হেতুর বিপাকে আবর্তিত হচ্ছে। এই হেতুর বিপাক হল কর্মের ফল। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কর্মের কোন কারক নাই ও বিপাকের ভোক্তা নাই, শুধু প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম সমূহ হেতুর বিপাকে আবর্তিত হচ্ছে। হেতুর বিপাকে ব্যক্তি বা সত্ত্বার উদ্ভব হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে ব্যক্তি বা সত্ত্বাই হল নামরূপ। রূপকে আমরা সাধারণ জড় পদার্থ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি, যদিও বৌদ্ধ দর্শনে রূপের ব্যাখ্যা ব্যাপক। চার মহাভূত ও ২৪ প্রকার ভূতোৎপন্ন রূপের সমন্বয়ে জড় রূপের আকৃতি ও প্রকৃতি। নাম হল-বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। নাম ও রূপ উভয়ে হেতুর বিপাকে পতিত হয়।

শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ স্থবির বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে নামের বিপাকের চিকিৎসা অর্থাৎ বিদর্শন জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। এখন তিনি রূপের বিপাকের ফলে কোন অশুভ বিপাকের সৃষ্ট শারীরিক অসুস্থতার ব্যবস্থা করার জন্য প্রজ্ঞাবংশ দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টায় যোগী ও রোগীর উভয়ের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাতের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

আমরা সর্ব প্রথম ভগবান তথাগত বুদ্ধের উদ্যান গাথা দিয়ে আমাদের বক্তব্য আরম্ভ করব-

“অনেক জাতি সংসারং, সন্ধাবিসং অনিচ্ছিসং,
গহকারকং গবেসন্তো, দুকখা জাতি পুনঙ্কনং।
গহকারক! দিট্ঠোহসি। পুনং গেহং ন কাহসি;
সন্না তে ফাসুকা ভগ্গা, গহকুটং বিসজ্জিতং,
বিসজ্জার গতং চিত্তং, তণ্হানং খয় মজ্জগা।” (ধম্মপদ-১৫৩ ও ১৫৪)

বাংলা- “আমি আমার দেহরূপ গৃহ নির্মাতাকে অন্বেষণ করতে করতে বহু জন্ম-জন্মান্তর সংসারে পরিভ্রমণ করেছি, কিন্তু তার দেখা পাই নাই। পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করা দুঃখকর। হে গৃহকারক (দেহরূপ গৃহ নির্মাতা) এবার আমি তোমাকে দেখেছি, তুমি আর গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না। তোমার গৃহ রচনার সকল উপকরণ আমি ভেঙ্গে ফেলেছি এবং গৃহকুট চূরমার করে দিয়েছি। আমার চিত্ত সংস্কার মুক্ত। আমি সকল তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করেছি।” এখানে তথাগত বুদ্ধ মানুষের অনন্ত তৃষ্ণার বিপাককে জন্মজন্মান্তরের হেতু হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ তৃষ্ণার কারণে মানুষকে এই সংসারে বার বার জন্ম নিতে হয়। তৃষ্ণার তারতম্য অনুসারে অর্থাৎ তৃষ্ণার প্রভাবে কৃতকর্মের বিপাকের ফলে জন্ম-জন্মান্তর কর্মফল ভোগ করতে হয়। বুদ্ধ তাঁর অস্তিমজ্ঞে গৃহকারক তৃষ্ণার নিরোধ করে অনন্ত জন্মের আবর্ত হতে নিজেকে মুক্ত করেছেন। তৃষ্ণামুক্ত হয়ে বুদ্ধ বিমুক্তি সুখে উক্ত গাথা আবৃত্তি করেছেন।

আমি আমার বক্তব্য আরও বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করার জন্য ধম্মপদ গ্রন্থ হতে আরও একটি গাথার উদ্ধৃতি দিচ্ছি-

আরোগ্য পরমা লাভা, সত্ত্বট্ঠি পরমং ধনং,
বিস্‌সাস পরমা ঐত্তী, নিস্‌সাপং পরমং সুখং।’ (ধম্মপদ-২০৪)

বাংলা- আরোগ্যই পরম লাভ, সত্ত্বটি পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ। এখানেই প্রশ্ন আসে আরোগ্য কার প্রয়োজন? সত্ত্বটির কেন প্রয়োজন? কিসের উপর বিশ্বাস? এবং নির্বাণ সুখই বা কি?

একবাক্যে উত্তর দিকে গেলে এই দাঁড়ায়-ব্যক্তি শারীরিক সুস্থ থেকে প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়ে ধর্মের উপর অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে নির্বাণ সাক্ষাৎ করে সকল দুঃখের উপশম করে পরম সুখ লাভ করতে পারেন। সুতরাং শারীরিক সুস্থতা, সন্তুষ্টি, তৃষ্ণাক্ষয় এবং ধর্মে বিশ্বাস নির্বাণ সুখের পূর্বশর্ত। যেহেতু আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধ সাহিত্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা, সে জন্য আমার বক্তব্য আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ করতে প্রয়াসী হবো। এখানে একটি প্রশ্নের অবতারণা করতেছি। কে নির্বাণ সুখ প্রত্যাশী? উত্তর-ব্যক্তি। আমরা আগেই, উল্লেখ করেছি ব্যক্তি হল সম্মতি সত্য। নির্বাণ কিন্তু পরমার্থ সত্য। সুতরাং সম্মতি সত্যের মাধ্যমে পরমার্থ সত্য নির্বাণ উপলব্ধি করতে হবে। তাই ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে। শুধু ব্যক্তির অস্তিত্ব নয়, তার শারীরিক সুস্থতার ও প্রয়োজন আছে। সেই জন্য বুদ্ধ বলেছেন- “আরোগ্য পরমা লাভা।” ব্যক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করতে আরও একটা সত্যকে স্বীকার করতে হয়। বুদ্ধ “কুমার প্রশ্ন” নামক খুদ্দক নিকায়ে এক স্থানে বলেছেন- ‘প্রশ্ন- “এক নাম কিং”? এক নাম কি অর্থাৎ সর্বসম্মতভাবে এক সত্য কি?

“উত্তর- সন্নে সত্তা আহারটট্ঠিতিকা।” সকল প্রাণী আহারের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ আহার ব্যতীত সত্তার অস্তিত্ব রাখার আর কোন বিকল্প নাই।

আমরা এখানে উপলব্ধি করতে পারছি ব্যক্তির অস্তিত্বের জন্য আহারের প্রয়োজন এবং উহা সর্বসম্মতভাবে সত্য। এখন আমরা ধম্মপদ হতে আরও একটা গাথার উল্লেখ করতেছি-

“জিঘৃক্ষা পরমা রোগা, সজ্জারা পরমা দুখা,

এতং ঞ্জত্ভা যথাভূতং, নিক্কাপং পরমং সুখং।” (ধম্মপদ - ২০৩)

বাংলা-বুড়ুক্ষা (ক্ষুধা) পরম রোগ, সংস্কার পরম দুঃখ। ইহা যথা ভূত রূপে জ্ঞাত হয়ে (পন্ডিতগণ) পরম সুখ নির্বাণের দিকে ধাবিত হন। উপরিউক্ত গাথা ভগবান তথাগত বুদ্ধ শিষ্য শ্রাবস্তী হতে আলবী রাজ্যে পদার্পণ করে আলবীবাসীদের নিকট ধর্মদেশনার সময় আবৃত্তি করেছিলেন। আলবী বাসীদের নিকট ধর্ম দেশনার সময় সন্ধ্যাকালে এক দরিদ্র ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু তিনি অনেক দূর পথ অতিক্রম করে অতিশয় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে জন্য বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণের প্রতি মনোযোগ দেয়ার মত তার অবস্থা ছিল না। কিন্তু বুদ্ধ এই ব্যক্তি পূর্ব জন্মকৃত পুণ্য প্রভাবে মুক্তি লাভের হেতু দেখেই শ্রাবস্তী হতে আলবীতে এসেছিলেন। বুদ্ধ প্রথমে এই ব্যক্তির ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করলেন। সেই দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষুধা নিবারণ করে বুদ্ধ তাঁর ধর্মদেশনা শুরু করেন। বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শুনে উক্ত দরিদ্র ব্যক্তি এই স্থানেই স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হন।

আমরা এখানে ব্যক্তির অস্তিত্বের জন্য আহার এবং মনোযোগ স্থাপনের জন্য সুস্থ শরীরের কথা উল্লেখ করলাম। বৌদ্ধ ধর্মে মাত্রাতিরিক্ত আহার করে ভোগ বিলাসে মস্ত হয়ে জীবন যাপন করাতে তৃষ্ণার উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই ভোজনে মাত্রাজ্ঞান রক্ষা করতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আহার গ্রহণ সময় নিম্নলিখিতভাবে অধিষ্ঠান করতে হয়।

“পটিসজ্জা যোনিসো পিডপাতং, পটি সেবামি
নেব দবায়, ন মদায়, ন মণ্ডনায়, ন বিভূসনায়,
যাবদেব ইমস্ কায়স্ ঠিতিয়া যাপনায়
বিহিংসুপরতিয়া ব্রহ্মচারিয়ানু গ্গহায়, ইতি
পুরাণঞ্চ বেদনং পটিহজ্জামি, নবঞ্চ বেদনং
ন উল্লা দেস্ সামি যাত্রা চ মে ভবিস্ সতি
অনবজ্জতা ফাসু বিহারো চাতি।”

বাংলা- সজ্জানে মনোযোগ সহকারে স্মরণ করতে করতে আমি এই পিডপাত (আহার) গ্রহণ করতেছি। ইহা ক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য নহে, শক্তি প্রদর্শনের জন্য নহে, মন্ডনের জন্য নহে, বিভূষণের জন্য নহে; ইহা শুধু চতুর্মহাভৌতিক রূপ কায়ের স্থিতি ও রক্ষার জন্য। ক্ষুধা নিবারণের জন্য ব্রহ্মচার্য সাহায্যার্থে, পুরাতন ক্ষুধা বেদনা বিনাসের জন্য, নব বেদনা অনুৎপত্তির জন্য। আমার পরিমিত আহার গ্রহণ, আমার জীবন যাপনের অন্তরায় হবে না। শুধু তাই নহে, ঔষধপত্র গ্রহণের সময় ভিক্ষুদের নিম্নবর্ণিত অধিষ্ঠান করতে হয়-

“পটিসজ্জা যোনিসো গিলান পচ্চয়, ভেসজ্জ
পরিকখারং পটি সেবামি, যাবদেব উল্লান্নাং
বেয্যা ব্যাধিকানং বেদনানং পটিঘাতায় অব্যাপজ্জা পরমতায়তি।”

বাংলা- আমি সজ্জানে মনোযোগ সহকারে স্মরণ করতে করতে রোগোপশমের জন্য এই ঔষধ সেবন করতেছি। আমার এই ঔষধ সেবন বিবিধ দুঃখদায়ক উৎপন্ন বেদনা সমূহের বিনাস হয়ে নিরাময় হউক। এমনকি অতীতে যে কোন সময় আহার গ্রহণ ও ঔষধ সেবনের জন্য উপরি উক্ত নিয়মে অধিষ্ঠান ভিক্ষু জীবনের জন্য অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে কর্মের বিপাকে অর্থাৎ কার্যকারণের হেতুতে সত্ত্বের বর্তমান রূপের সমুদান হয়েছে। ত্রিপিটকে অভিধর্ম শাস্ত্র

মতে রূপের সমুখান বা অবস্থান্তরের জন্য কর্ম, চিন্তা, ঋতু, আহার প্রভৃতি চার বিষয়ের বিশেষ ভূমিকা আছে। এই চার বিষয়ের হেতু সমুখিত রূপকায় পূর্ব জন্মার্জিত কর্মের প্রভাবে জগতের স্বভাব ধর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত সময় পর্যন্ত স্থিত থাকবে। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, রূপের স্থিতির জন্য আহারের প্রয়োজন। আহারের উপর স্থিতরূপ সর্বদাই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল রূপের সর্বদাই বৃদ্ধি ও ক্ষয় হচ্ছে। রোগব্যাদির কবলে রূপ প্রতিনিয়ত উন্মুক্ত থাকছে। তাই শরীরের প্রত্যক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে এই রোগ ব্যাদির নিদান, উপসর্গ এবং রোগোপশমের জন্যে ভৈষজ্যাদির তত্ত্ব ও উহাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে জানার মানুষের আদিম কাল হতে এক সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে গেছে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সত্ত্বের কায়রূপে প্রকৃতি ও গঠন নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারি। বৌদ্ধ মতে কায় সত্যত পরিবর্তনশীল, তাই উহা অনিত্য, অনিত্য বস্তু মাত্রই অশুচি। তাই আমাদের এই রূপ কায়কে অশুচি হিসাবে চিহ্নিত করে কায়গতাস্মৃতি ভাবনার প্রবর্তন করা হয়েছে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য জগতে এক মাত্র সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাবে কায়গতাস্মৃতি ভাবনা প্রবর্তিত হয়। অন্য কোন প্রাচীন ভাবনা পদ্ধতিতে কায়গতাস্মৃতি ভাবনাকে বিষয়ীভুক্ত করার মত মৌলিক চিন্তাধারার সূত্র পরিলক্ষিত হয় না। ভগবান বুদ্ধ আমাদের এই শরীরকে ৩২ প্রকার অশুচি বিষয় বিভাগ করে কায়গতাস্মৃতি ভাবনার প্রবর্তন করেছিলেন। কায়গতাস্মৃতি ভাবনায় শমথ ও বিদর্শন ভাবনার দুইটা পদ্ধতির স্বরূপ রয়েছে। প্রতিকূল বশে কায়গতাস্মৃতি ভাবনা হল শমথ ভাবনা এবং ধাতুবশে কায়গতাস্মৃতি ভাবনা হল বিদর্শন ভাবনা। বুদ্ধ বলেছেন-

“ এক ধম্মো ভিক্ষবে ভাবিতো

বহুলীকতো মহতো সংবেগায় সংবত্ততি মহতো

অখায় সংবত্ততি মহতো যোগক্খেমায়

সংবত্ততি, সতি সম্পজ্ঞা ঞ্জায় সংবত্ততি, ঞ্জান

দস্সন পটিলভায় সংবত্ততি দিট্ঠ ধম্মসুখ-

বিহারায় সংবত্ততি বিজ্জা বিমুত্তি ফল সচ্ছি কিরিয়ায়

সংবত্ততি, কতমো একধম্মোঃ কায়গতা সতি---”

বাংলা- হে ভিক্ষুগণ, এক ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসংবেগের হেতু হয়ে থাকে, যোগক্ষেমের হেতু হয়ে থাকে, মহতী স্মৃতি সম্প্রজ্ঞার হেতু হয়ে থাকে, মহান জ্ঞানদর্শন প্রতিলাভের হেতু হয়ে থাকে, দৃষ্ট ধর্ম সুখ বিহারের হেতু হয়ে থাকে, বিদ্যাবিমুত্তি ফল প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় হেতু থাকে, সেই এক ধর্ম কি? কায়গতাস্মৃতি”।

কায়গতাস্থিতি

এখান আমরা খুদ্দকপাঠ, পরমথজ্যোতি, মহাসতিপট্টান সুস্ত, বিস্তদ্ধ মার্গ, সংবুদ্ধ মিকায় প্রভৃতি গ্রন্থ হতে কায়গতা স্থিতি ভাবনায় বর্ণিত আমাদের শরীরের ৩২ প্রকার অশুচি বিষয় আলোচনা করে আমাদের শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত বিষয়ের অবতারণা করবো। উপরি উক্ত গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে-

“পুন চ পরং ভিক্ষবে, ভিক্ষু ইমং এব কায়ং উদ্ধং পদতলা অধো কেসমথাকা তচ পরিয়ন্তং পুরং নানপ্লকারসস্ অসুচিনো পচ্চবেক্খতি। অস্থি ইমস্মিং কায়ে-কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো, মংসং, নহাৰু, অটঠি, অটঠিমিঞ্জা, বক্কং, হৃদয়ং, যকনং, কিলোমকং, পিহকং, পপফাসং, অণ্ডং, অণ্ডণ্ণনং, উদরিয়ং, করীসং, পিস্তং, সেমহং, পুবেবা, লোহিতং, সেদো, মেদো, অস্সু, বসা, খেলো, সঙঙ্ঘনিকা, লসিকা মুত্তং তি। এবং তথ তথ মথলুসং অটঠি মিঞ্জেম সংগহেত্বা দেসিতং কায়গতা সতি কোট্টাসভাবনাদিপরিয়ায়ং দ্বত্তিসাকারকস্মট্টানং আরদ্ধং, তস্সায়ং অথবল্লনা।”

বাংলা- পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই কায়ের পদতল উর্দ্ধে কেশ মস্তকের অধো এবং ত্বক বা চামড়া দিয়ে পরিবেষ্টিত নানা অশুচিপূর্ণ বলে প্রত্যবেক্ষণ করে। এই কায়ের আছে-কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, পেশীতন্তু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক (মূত্রাশয়), হৃদয়, যকৃত, ক্রোম, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদরীয় (উদরস্থ অপক খাদ্য), করীষ (বিষ্ঠা), পিস্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, লোহিত (রক্ত), স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা (তৈলাক্ত, স্নেহ), খেল (খুথু), সিংখনী, লসিকা, মুত্র প্রভৃতি। এইভাবে অস্থিমজ্জায় মস্তিস্কসহ একত্র সংগ্রহ করে প্রতিকূল মনস্কার বশে দ্বাত্রিংশাকার কর্মস্থান দেখিত।”-এই ভাবে অর্থ গ্রহণ করা অভিপ্রেত। এখানে পূর্বগামী ভাবনা নির্দেশ আছে-ইমং এব কায়ে-এই চার মহা ভৌতিক পুঁথিকায়, উদ্ধং পাদতলা- পাদতল হতে উপরে। অর্ধো কেসমথাকা-কেশমস্তক হতে নীচে। তচ পরিয়ন্তং-সমান্তরাল ভাবে ত্বক দ্বারা পরিচ্ছন্ন (ত্বক পরিবেষ্টিত), পুরং নানা প্লকারসস্ অসুচিনো পচ্চবেক্খতি-এই শরীর কেশাদি নানা প্রকার অশুচি পরিপূর্ণ বলে প্রত্যবেক্ষণ করে দেখে। কি প্রকার? এই কায়ের আছে-কেশ, লোম----মুত্র।”

কায়গতাস্থিতি ভাবনায় এই ৩২ প্রকার অশুচি বিষয় বাক্য দ্বারা, মননের দ্বারা, বর্ণনঃ সংস্থানতঃ দিশাতঃ, অবকাশতঃ ও পরিচ্ছেদতঃ এই সাত প্রকার উদগ্রহ কৌশল্য শিক্ষা করতে হয়। এই ৩২ প্রকার অশুচি বিষয় আমাদের শরীর গঠন ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে উহাদের সহিত সম্পর্ক রেখে বৌদ্ধ শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী এই ৩২ প্রকার অশুচি বিষয়ের বর্ণ, সংস্থান বা আকৃতি, দিশা বা দিক, অবকাশ বা অবস্থান এবং পরিচ্ছেদ ক্রমে আলোচনার সূত্রপাত করবো।

১। বর্ণ-কেশাদির বর্ণ সম্বন্ধে সঠিক ব্যবস্থাপন করা কর্তব্য।

২। সংস্থান বা আকৃতি-উহাদের আকৃতি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

৩। দিশা বা দিক-এই ৩২ প্রকার অশুচি বিষয় সম্বন্ধে দিক নির্ণয় করতে গিয়ে নাভিকে নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারিত করে নাভির উপরে উপরি দিশা এবং নিচে অধঃ দিশা নির্ধারিত করা হয়েছে। কেশাদি যে দিশাখায় আছে উহাকে কোষ্টাস বা ভাগ বলা হয়।

৪। অবকাশ বা অবস্থান-কেশাদি যেই অবকাশে বা অবস্থানে থাকে, সেইভাগ বা কোষ্টাস উহার অবকাশ স্থির করা হয়েছে।

৫। পরিচ্ছেদ- পরিচ্ছেদ দুই প্রকার (১) সভাগ পরিচ্ছেদ ও (২) বি-সভাগ পরিচ্ছেদ। যেই কোষ্টাসে বা ভাগে কেশাদি নাচে, উপরে ও সমান্তরালভাবে থাকে, উহা সেই বস্তুর সভাগ পরিচ্ছেদ। কেশাদি লোম নহে, এই প্রকারে অমিশ্রকৃত বশে বি-সভাগ পরিচ্ছেদ জ্ঞাতব্য।

১। কেশসমূহ-বর্ণ-কেশ স্বাভাবিকভাবে কালবর্ণ। উহা উজ্জ্বল অরিষ্টকবর্ণ। আকৃতি-কেশ দীর্ঘ গোলাকার তুলাদণ্ডের মত। দিশা বা দিক-উপরি দিশায় জাত। অবস্থান-উভয় পাশের কর্ণমূলের উপরি কেশসীমা দ্বারা, সম্মুখে কপালের কেশসীমা, ও পিছনে গ্রীবা সন্ধির দ্বারা কেশরাশির অবস্থান সীমাবদ্ধ। মস্তকের খুলি আর্দ্র চর্ম দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরিচ্ছেদ-কেশরাজি মস্তকের চামড়ায় ব্রীহি বা ধান্যের অগ্রমাত্র প্রবেশ করে প্রতিষ্ঠিত। চামড়ায় কেশের মূল, উপরিভাগে ফাঁকা এবং সমান্তরালভাবে পরস্পর পরিচ্ছন্ন। দুই কেশ একত্রে নাই, ইহা সভাগ পরিচ্ছেদ। কেশসমূহ লোমসমূহ নহে। লোমসমূহ কেশসমূহ নহে। এভাবে অবশিষ্ট একত্রিংশ অশুচি দ্রব্যের সহিত কেশসমূহ অমিশ্রকৃত। কেশসমূহ প্রত্যেকে এক এক ভাগ ইহা বিসভাগ পরিচ্ছেদ। ইহা কেশ সমূহের বর্ণাদিতঃ ব্যবস্থাপন।

২। লোমসমূহ-বর্ণ লোমসমূহ দেখতে কেশের মত পুরাপুরি কালবর্ণ নহে, কিন্তু কালপিঙ্গল বর্ণ হয়ে থাকে। সংস্থান বা আকৃতি-লোমসমূহ তালগাছের শিকরের ন্যায় অগ্রভাগ বাঁকা হয়ে থাকে। দিশা-লোম শরীরের উর্দ্ধ ও অধঃউভয় দিশায় দেখা যায়। অবকাশ-শরীরের মাথার কেশ সমূহের অবস্থান, হাতের ও পায়ের তল ছাড়া অবশিষ্ট অংশের চর্ম বেষ্টিত স্থানে দেখা যায়। পরিচ্ছেদ-শরীরের বেষ্টিত চামড়ায় লিঙ্গমাত্র (১২৯৬ অনু) প্রবেশ করে আপন মূলদ্বারা প্রতিষ্ঠিত। উপরে ফাঁকা এবং সমান্তরালভাবে অন্যান্যের দ্বারা পরিচ্ছন্ন। দুই লোম একত্রে নেই, ইহা ইহাদের সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

৩। নখ সমূহঃ বিশটা নখপাত্রেয় নাম। বর্ণ- মাংসের সহিত সংযুক্ত দৃশ্যমান অংশ সাদা এবং মাংসের ভিতরের অংশ তাম্রবর্ণ। সংস্থান-মৎস্যের শঙ্কাকৃতি অথবা মধুকা ফলের কোষাকৃতি, তবে সংস্থানের সহিত স্থিতাকৃতি। দিশা-পায়ের নখসমূহ নীচের অংশে এবং হাতের নখসমূহ উপরিভাগে জাত বলে উভয়ে অংশে প্রতিষ্ঠিত। অবকাশ-

হস্তপদের অঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। পরিচ্ছেদ-হাতের ও পায়ের অঙ্গুলীর মাংস পেশীর উপরে প্রতিষ্ঠিত, বাহিরে ও অগ্রভাবে ফাঁকা এবং তীর্যকভাবে অন্যান্য দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। দুই নখ একত্রে নেই-এইটা হল উহাদের সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

৪। দাঁতসমূহ -যার পরিপূর্ণ দাঁত আছে তার মোট ৩২টি দন্তাস্থি আছে। বর্ণতঃ দাঁত শ্বেতবর্ণ। সংস্থান- দাঁতের নানা প্রকার আকৃতি বা গঠন আছে। তাদের মধ্যে মাঝখানের চারটা দাঁত মাটির ঢিভিতে আলাবু বীজের মত শারীবদ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠিত। উহাদের উভয় পার্শ্বে একেকটি এক দাঁত এক মূলিক এবং এক কোটিক। এই দাঁতগুলি মল্লিকা মুকুল সদৃশ। তারপর প্রত্যেক পার্শ্বে দাঁতসমূহ দুই মূল এবং দুই কোটিক। উহারা দেখতে গাড়ীর খুঁটি সদৃশ এই দাঁতগুলির পর দুই পার্শ্বে দুইটা দাঁত তিনমূলিক ও তিন কোটিক। তারপর দুই পার্শ্বে দুইটা দাঁতের চার মূল ও চার কোটিক (অগ্রভাগ)। অনুরূপ ভাবে উপরের দাঁতসমূহও প্রতিষ্ঠিত আছে। দিশা-উপরি দিশায় জাত। অবকাশ-দুই চোয়াল হাড়ে প্রতিষ্ঠিত। পরিচ্ছেদ-উহা নিজ, নিজ চোয়ালের হাড়ে নিজ মূলে প্রতিষ্ঠিত, মাঝখানে ফাঁকা এবং তীর্যক ভাবে অন্যান্য দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। দুইটা দাঁত এক নয়-এইটা সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

৫। ত্বক- সমস্ত শরীর পুরু ত্বক দ্বারা আচ্ছাদিত। ত্বকের উপরের অংশ পাতলা কালো, সাদা পীত বর্ণাদি হয়ে থাকে এবং উহা সমস্ত শরীর হতে পৃথক করে ভাঁজ করলে একটা বদরী ফলের আঁটির আকার হবে। পুরু ত্বকের বর্ণ সাদা। অগ্নিজ্বালা, প্রহার দ্বারা বিধ্বংসিত ত্বকের সাদা বর্ণ ধরা পড়ে। সংস্থান- শরীর সংস্থান সদৃশ হয়ে থাকে। ইহা ত্বকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। বিস্তারিতভাবে পদাঙ্গুলীর ত্বক গুটীপোকায় বহিরাকৃতির মত হয়, পায়ের উপরিভাগের গঠন জুতোর (উপাহরণ) উপরাংশের ন্যায়। জঙঘার ত্বক ভাত আবরণের তালপাতা সদৃশ। উরুর ত্বক তন্মূল ভর্তি দীর্ঘ থলির মত। নিতম্বের ত্বক জলপূর্ণ পরিস্রাবণের কাপড়ের পুটলীর মত। পীঠের ত্বক খাটের উপর আড়াআড়ি প্রসারিত চামড়ার মত। কুক্ষীর ত্বক বীনা দ্রোণিতে আড়াআড়িভাবে প্রসারিত বাচুরের চামড়ার মত। বুকের চামড়া সাধারণতঃ আকারে সমকোনের ন্যায়। দুই বাহুর ত্বক তুলীরবদ্ধ চামড়ার ন্যায়। হাতের চামড়া কুরের কোষের ন্যায় অথবা সাপের খোলস সদৃশ। হাতের আঙ্গুলের ত্বক কুঞ্চিকাকোষ সদৃশ (চাবির থলি)। গ্রীবার ত্বক গলায় আবরণের মত। মুখের ত্বক ক্ষুদ্র কীটের বাসার ন্যায় অনেক ছিদ্রবিশিষ্ট। মাথার ত্বক ভিক্ষাপাত্রের ন্যায়। দিশা-দুই দিশাতে জাত। অবকাশ-ত্বক সমস্ত শরীরকে আবৃত করে আছে। পরিচ্ছেদ-ত্বক যাতে প্রতিষ্ঠিত তাতে আবদ্ধ হয়ে আছে এবং উপরে ফাঁকা। ইহাই ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

৬। মাংস-শরীরে নয়শত মাংস পেশী আছে। বর্ণ-মাংসের বর্ণ কিংশুক ফুলের মত লাল। সংস্থান- মাংসের গঠন নানা প্রকার হয়ে থাকে। জঙঘার মাংস তালপত্রের মধ্যে সংরক্ষিত ভাত পিন্ডের আকার। উরু মাংস-চূর্ণ পাথরের স্তম্ভ সদৃশ। নিতম্বের মাংস

উননের অগ্রভাগ সদৃশ। পীঠের মাংস পাতলা তাল রসের থালার মত। বৃকে দুই পাঁজরের মধ্যবর্তী মাংস শস্য ভাভারের কৃষ্ণ উপর পাতলা মাটির প্রলেপের ন্যায়। স্তনের মাংস নিম্নমুখী মাটির গোলাকৃতি পিণ্ড সদৃশ। বাহুদ্বয়ের মাংস এক জোড়া বৃহৎ চর্মহীন ইঁদুরের মত। এইভাবে স্থূল মাংসসমূহ সম্বন্ধে জেনে নিয়ে ছোট ছোট মাংসসমূহ সম্বন্ধে বিবেচনা করে দেখতে হয়। যেমন গন্ড মাংস কবাঞ্জবীজ সদৃশ। দেখতে নুহিপত্রের মতন। নাসিকার মাংস নিম্নমুখী পাতার জড়িত বড় থলের মত। অক্ষি গোলকের মাংস অর্ধ ডুমুরের ফল সদৃশ, মাথার মাংস ভিক্ষা পাত্রের উপর পাতলাভাবে ছড়ানো উত্তপ্ত তেলের পাতলা স্তর সদৃশ। দিশা-উভয় দিশায়-জাত। অবকাশ-তিন শত বিশ অস্থিকে অনুলেপন করে স্থিত। পরিচ্ছেদ-মাংস অস্থি কংকালের উপর প্রতিষ্ঠিত স্তর। উপরে ত্বকের দ্বারা আবৃত এবং পাশাপাশি পরস্পরের সহিত সভাগ পরিচ্ছন্ন। বিসভাগ পরিচ্ছন্ন কেশসদৃশ।

৭। পেশীতন্তু (নহারু কন্ডরা **Sinew**) শরীরের অবকাঠামোতে নয় শত পেশীতন্তু আছে। বর্ণ-শ্বেতবর্ণ। সংস্থান-বিবিধ প্রকার, খুব বড় পেশীতন্তু মিষ্টি আলুর অঙ্কুর সদৃশ। মাঝারী পেশীতন্তু শূকর ধরবার জালের দড়ির আকার এবং ছোট পেশীতন্তু গ্রীলংকায় ব্যবহৃত বীণার বড় তারের মতন। আরও ছোট পেশীতন্তু মোটা সূতার আকারের হয়ে থাকে। হাত পায়ের পৃষ্ঠের পেশীতন্তু পাখীর নখের মত। মাথার পেশীতন্তু গৈয়ো বালকদের মাথার স্থাপিত দু'কূল তন্তুর উন্মুক্তভাবে পরস্পরের উপর টানা জালের মত। পৃষ্ঠদেশের পেশীতন্তু রৌদ্রে প্রসারিত ভেজা মাছ ধরা জালের মত। অবশিষ্ট পেশীতন্তু শরীরের কাঠামোতে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে প্রসারিত হয়ে শরীরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থলির জালের মত। দিশা-উভয় দিশার জাত। তাদের মধ্যে পাঁচটা বড় পেশীতন্তুকে কন্ডরা (**Tendon**) বলা হয়। উহারা ডান কর্ণমূল হতে আরম্ভ করে সম্মুখে ও পশ্চাতে বেঁটন করে বামপার্শ্ব পর্যন্ত যায়। অনুরূপভাবে পাঁচটা পেশীতন্তু বাম কর্ণমূল হতে শুরু করে সম্মুখ ও পশ্চাৎ বেঁটন করে ডানপাশ পর্যন্ত যায়। পাঁচটি পেশীতন্তু গ্রীবার ডানমূল হতে আরম্ভ করে বাম পার্শ্বের সম্মুখে ও পশ্চাতে বেঁটন করে যায়। অনুরূপভাবে গ্রীবার বাম মূল হতে আরম্ভ করে বাম পার্শ্বের সম্মুখ ও পশ্চাৎ বেঁটন করে যায়। তারপর দশটা পেশীতন্তুর মধ্যে পাঁচটা পশ্চাতে ও পাঁচটা সম্মুখে বেঁটন করে ডান হাতে যায়। অনুরূপভাবে বাম হাতে পেশীতন্তু যায়। এইরূপ দুই পায়ে ও পেশীতন্তু যায়। সুতরাং এই ৬০টা বড় পেশীতন্তু শরীরের অবকাঠামোর সংরক্ষক বা পরিপূরক হিসাবে কাজ করে।

অবকাশ-শরীরের কাঠামোতে অস্থি ও চর্মের সহিত এবং মাংস ও চর্মের সহিত বন্ধন করে প্রতিষ্ঠিত। পরিচ্ছেদ-তিন শত হাড়ের সহিত পশ্চাতে স্থিত এবং সম্মুখে চর্ম ও মাংসের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং মধ্যস্থানে পরস্পরের সহিত জড়িত। ইহা পেশীতন্তু সভাগ পরিচ্ছন্ন। বি-সভাগ পরিচ্ছন্ন কেশ সদৃশ।

৮। হাড়সমূহ- ৩২ টি দাঁতের হাড় বাদ দিয়ে শরীরের তিনশত হাড় দেখা যায়।

হৃৎপাদ মংসসিতা চতুস্টি দ্বিধা নিহকা

চতুর্গে পৃথকা জঙঘটটি দ্বিজানুরুটটিচ।

অট্টারসা পিটটিটটিনি, চতুর্বীসতি ফাসুকা

হৃদসূয়া হৃদয়েকং দ্বকখলু কোট্ট বাহুকং।

চতুরো অগ্গ বাহুটটি, সন্তগীব দ্বিহনুকং,

নহা সিকেকং দ্বকখিকল্লা নলাট মুদ্ধমেকং

নবসীস কপালটটি এবং তিসত অটটি কন্তি।

বঙ্গানুবাদ- এই শরীরে হাতের হাড় ৬৪, পায়ের হাড় ৬৪, মাংসাশ্রিত হাড় ৬৪, পায়ের গোড়ালীর হাড় ২, পায়ের গোছের (গল্ফ) হাড়-৪, জঙঘার হাড়-৪, হাঁটুর হাড়-২, উরুর হাড়-২, কটির হাড়-২, পৃষ্ঠের হাড়-১৮, ফাসুকা বা পাঁজরের হাড়-২৪, বুকের হাড়-১৪, হৃদয়ের হাড়-১, গলার হাড়-২, কাঁধের হাড়-২, বাহুর হাড়-২, অগ্রবাহুর হাড়-৪, গ্রীবার হাড়-৭, চোয়ালের হাড়-২, নাকের হাড়-১, চোখের হাড়-২, কানের হাড়-২, ললাটের হাড়-১, মুর্দার হাড়-১, মাথার খুলির হাড়-৯, মোট-৩০০ হাড় আছে। বর্ণ- হাড়ের বর্ণ সাদা, সংস্থান-বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। যেমন পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগের হাড় কুচিলা বীজ সদৃশ। পায়ের মধ্যভাগের হাড় অপূর্ণ কাঁঠালের বীজ সদৃশ, আঙ্গুলের মূল হাড়গুলি ছোট ড্রামের মত। আবার ময়ূরের খুটির মত দেখায়। পায়ের পশ্চাতের হাড়গুলি মিষ্টি আলুর মূলের মত। পায়ের গোড়ালীর হাড় এক আঁটি বিশিষ্ট তালবীজ সদৃশ। পায়ের গোছের হাড় এক সূতায় গণিত দুই বলের মত। জঙঘার হাড়ের মধ্যে ছোটটা ধনুর তীরের মত এবং বড়টা বড় জীর্ণ সাপের পীঠের ন্যায়। পায়ের গোছার উপর স্থাপিত জঙঘার হাড় মৃদঙ্গের শীর্ষ সদৃশ। জানুর হাড় নিম্নমুখী ফেনা পিণ্ডের মত। উরুর হাড় অমসৃণ পরসু বা কুড়ালের দন্ডের ন্যায়। উরু হাড়ে যেখানে কটির হাড়ের উপর স্থাপিত সেখানকার আকার স্বর্ণকারের জ্বালানী কাঠের আটির মত। সংযোগ স্থান উপরি হিন্ন পুন্নাগ ফুলের মত। কটির হাড়দুটা এক সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় কুম্ভকারের উন্মানের মত। নিতম্বের হাড় অধঃমুখ গৃহীত সাপের ফনার ন্যায়। উহাদের সাতটি জায়গায় ছিদ্র আছে। ১৮ টি পীঠের হাড় একটা উপর একটা স্থাপিত, ভিতরে শীশার পাতের মত এবং বাহিরে জপ মালার সূতার মত। উহাদের প্রত্যেকের করাতে দাঁতের কাঁটা আছে। ২৪টা পাঁজর একতাবদ্ধভাবে শ্রীলংকায় ব্যবহৃত অপূর্ণ কাস্তের মত। সকল পাঁজর একত্র করলে শ্বেত মোরগের প্রসারিত ডানার মত। ১৪টি বুকের হাড় পুরাতন রথের সারিবদ্ধ তক্তার ন্যায়। হৃদয়ের হাড় কাঠের চামচের মত। গলার হাড় ক্ষুদ্র লৌহ দন্ডের মত। উহার নিচের হাড় অর্ধ চন্দ্রের মত। কাঁধের হাড় কুড়ালের ফলার মত, শ্রীলংকার জীর্ণ কোদালের মত দেখায়। বাহুর হাড় মুখ দেখবার আয়নার হাতল সদৃশ। অগ্রবাহুর হাড় যমক তাল বৃক্ষের কান্ডের মত।

মনিবন্ধের হাড় একত্রে ভাজ করা লৌহ পাতের মত । হাতের পীঠের হাড় চেষ্টা মিষ্টি আলু গুচ্ছের মত । হাতের আঙ্গুলের মূলের হাড় ছোট ছোট ড্রামের মত । আঙ্গুলের মধ্যবর্তী হাড় কাঁঠাল বীজের অপরিপূর্ণ অবস্থার মত । আঙ্গুলের অগ্রভাগের হাড় কুচিলা বীজ সদৃশ (**Nux Vomica seed**) । ঘাড়ের ৭টি হাড় একটার পর একটা আঁটির বাঁশের টুকরা গণ্ডিত পাত সদৃশ । নীচের চোয়ালের হাড় কামারের লোহার হাতুড়ির সংযোগ সদৃশ । উপরের চোয়ালের হাড় অবলম্বন ছুরির মত । চক্ষুকূপ ও নাসিকাকূপের হাড় শাস উত্তোলিত কঁচি তাল বীজ সদৃশ । ললাটের হাড় অধোমুখে স্থাপিত ভগ্ন ঝিনুকের ফলক সদৃশ । কর্ণমূলের হাড় নাপিতের ক্ষুরের কোষ সদৃশ । ললাট ও কর্ণমূলের উপর যে স্থানে মাথার পাগড়ি স্থাপিত হয় সে স্থানের হাড় ঘনঘূতের কঠিন আবরণের টুকরা সদৃশ । মুর্দ্ধার হাড় প্রান্তভাগে ছিদ্র বিশিষ্ট নারিকেলের আকার । মাথার খুলি সেলাই করে একত্রে লাউয়ের খোল সদৃশ । দিশা-উভয় দিশায় জাত । অবকাশ-শরীরের সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত-বিশেষ স্থানের অবস্থান এইরূপ, ঘাড়ের হাড়ের উপর মাথার হাড়, পীঠের হাড়ের উপর ঘাড়ের হাড়, কটির হাড়ের পীঠের হাড়, উরুর হাড়ের উপর কটির হাড়, জঙঘার হাড়ের উপর উরুর হাড়, পায়ের গোছার উপর জঙঘার হাড়, পায়ের পশ্চাতের হাড়ের উপর পায়ের গোছার হাড়, পায়ের পশ্চাতের হাড় পায়ের গোছার হাড় ভারসাম্য রক্ষা করে----এইভাবে ঘাড়ের হাড় মাথার খুলির ভারসাম্য রক্ষা করে । পরিচ্ছেদ-হাড়ের ভিতর হাড় মজ্জা, উপরে অগ্রপশ্চাতে একটা হাড়ের সহিত আরেকটা হাড় প্রতিষ্ঠিত । ইহা সভাগ পরিচ্ছেদ । বিসভাগ/পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ ।

৯ । হাড়ের মজ্জা-হাড়ের মজ্জা হাড়ের অভ্যন্তরে থাকে । বর্ণ- সাদা, সংস্থান- বড় বড় হাড়ের অভ্যন্তরে মজ্জা বাঁশের নালীতে প্রক্ষিপ্ত উত্তপ্ত বড় বড় বেতের অগ্রভাগের মত । ছোট ছোট হাড়ের মজ্জা বাঁশের খন্ডিত নালীতে প্রক্ষিপ্ত উত্তপ্ত মোছানো কাঁচ বেতের অগ্রভাগ সদৃশ । দিশা-উভয় দিশায় জতি । অবকাশ-হাড়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত । পরিচ্ছেদ-হাড়ের অভ্যন্তরের মত পরিচ্ছন্ন ইহা সভাগ পরিচ্ছেদ । বি সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ ।

১০ । মুত্রাশয় (বৃক্ক)-একই বন্ধনে দুইটা মাংস পিণ্ড সদৃশ । বর্ণ- পালিভদ্রক বীজের মত মন্দা লাল বর্ণ । সংস্থান- বালকদের ক্রিয়ার যমক গোল বলের মত অথবা একই বৃন্তে ঝুলন্ত দুই আশ্রফলের মত । দিশা- উপরি দিশায় জাত । অবকাশ-ঘাড় হতে নিক্রান্ত স্থূল পেশীতন্তু এক মূল অবলম্বন করে অল্প গিয়ে দুই ভাবে বিভক্ত হয়ে হৃদয় মাংস পেশীকে বেষ্টন করে অবস্থিত । পরিচ্ছেদে-মূত্রাশয় আপন পরিচ্ছেদ পরিচ্ছন্ন ইহা উহাদের সভাগ পরিচ্ছেদ । বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ ।

১১। হৃদয়- হৃদয় বলতে হৃদয়ের মাংস বুঝায়। বর্ণ-উহা রক্ত পদ্মপত্রের পীঠের বর্ণ। সংস্থান-বাহিরের পাপড়ি সমূহ উৎপাঠিত করে অধো মুখ স্থাপিত পদ্ম মুকুলের মত দেখায়। পুন্নাগ ফলের অগ্রভাগ ছিন্ন উহা একদিকে ফাঁকা। উহার বাহিরে মসৃণ এবং ভিতরে কোসতকী ফলের (তিক্ত লাউ) অভ্যন্তরের মত। প্রজ্জীবানদের হৃদয় অল্পবিকাশিত এবং মন্দ প্রজ্জীবানদের হৃদয় মুকুলিত। হৃদয় বাস্তুর সেখানে মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান ধাতু অবস্থান করে সেই স্থান ব্যতীত হৃদয়ের অবশিষ্ট অংশ আধা পসত (অন্ধাঞ্জলি) মাত্র রক্ত ধারণের মাংসের পাত্র। হৃদয়ের রক্তের রং রাগচরিতর লাল, দ্বেষ চরিত্রের কাল, মোহ চরিত্রের মাংস ধোয়া জলের মত, বিতর্ক চরিত্রের মসুরের ফেণা সদৃশ, শ্রদ্ধা চরিত্রের পীত কনিকার ফুলের মত, বুদ্ধি চরিত্রের জ্যোতিময় স্বচ্ছ, পলিশ করা অনাবিল বিশুদ্ধ পরিশোধিত মূল্যবান মনির মত। দিশা-উপরি দিশায় জাত। অবকাশ-শরীরের অভ্যন্তরে দুই স্তনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। পরিচ্ছেদ-হৃদয় ভাগ দ্বারা পরিচ্ছন্ন, ইহা হৃদয়ের পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

১২। যকৃৎ-যকৃৎ দুই খন্ড মাংস সদৃশ। শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ণ-রক্তবর্ণ, শ্বেতপদ্মের বাহিরের পাপড়ির বাহিরের অংশের বর্ণ। সংস্থান-মূলে এক এবং অগ্রভাবে দুই মূল বিশিষ্ট সামুদ্রিক প্রবালের মত। স্বল্পধী সম্পন্ন ব্যক্তিদের যকৃৎ ২/৩ ভাগে বিভক্ত থাকে। দিশা-যকৃৎ উপরিদিশায় জাত। অবকাশ- দুই স্তনের অভ্যন্তরে ডান পার্শ্ব নিশ্রয় করে অবস্থিত। পরিচ্ছেদ-উহা নিজের অংশ দ্বারা পরিচ্ছন্ন, ইহা সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

১৩। ক্রোম (ঝিল্লের আবরণ) ক্রোম-দুই প্রকারের হয়ে থাকে। (১) প্রতিচ্ছন্ন ও (২) অপ্রতিচ্ছন্ন, বর্ণ-উভয় ক্রোম শ্বেতবর্ণ, দুকলপিলোতিক বর্ণ (সাদা নেকড়া)। সংস্থান-অবস্থান অনুযায়ী সংস্থান। দিশা-অপ্রতিচ্ছন্ন ক্রোম উপরি দিশায় এবং অপ্রতিচ্ছন্ন ক্রোম উভয় দিশায় জাত। অবকাশ-প্রতিচ্ছন্ন ক্রোম হৃদয় ও মূত্রাশয় প্রতিচ্ছাদন করে এবং প্রতিচ্ছন্ন ক্রোম সমস্ত শরীরের চামড়ার নিচে মাংস আচ্ছাদন করে স্থিত। পরিচ্ছেদ-নীচে মাংস, উপরে চামড়া এবং তির্যক ক্রোম দ্বারা পরিচ্ছন্ন, ইহা সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

১৪। গ্লীহা-গ্লীহা পাকস্থলী হতে জিহ্বার মত শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত মাংসপিণ্ড সদৃশ। বর্ণ-বর্ণ নিম্নস্তি ফুলের মত গাঢ় নীল বর্ণ। সংস্থান- কৃষ্ণবর্ণ ঝাড়ের জিহ্বার বন্ধনহীন সাত আঙ্গুল পরিমান আকৃতি। দিশা-উপরি দিশায় জাত। অবকাশ-পাকস্থলীর আবরণের অগ্রভাগ হতে হৃদয়ের বাম পার্শ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। কোন প্রকারে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে স্থানচ্যুত হলে প্রাণীগণের জীবন ক্ষয় হয়ে থাকে। পরিচ্ছেদ-গ্লীহাভাবে পরিচ্ছন্ন ইহা ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

১৫। ফুসফুস (পপ্ফাস) শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। ২/৩ মাংস পিণ্ডে বিভক্ত (দ্বিভাগমাংসখন্ড)। বর্ণ- রক্তবর্ণ, অর্ধপক্ক ডুমুরের ফল সদৃশ। সংস্থান-বিষম ছিন্ন পুরু পীঠার খন্ডিত টুকরার মত। অনেকের মতে ইহার আকার ছাদের টাইলের ত্বপের অংশ

বিশেষের মত। ইহার ভিতরে নিরস এবং চর্বিত খড়ের স্তূপের মত রসালো নির্ঘাস ইহাতে নাই। কারণ অতীত কর্মের তেজ ধাতুর উষ্ণতা দ্বারা শরীরে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দ্রুণ ফুসফুস নির্ঘাসিত। দিশা-উপরি দিশায় জাত। অবকাশ-শরীরের অভ্যন্তরে দুই স্তনের মধ্যখানে হৃদয় ও যকৃৎ আচ্ছন্ন করে বুলে থাকে। পরিচ্ছেদ-ফুসফুস ভাগের দ্বারা পরিচ্ছন্ন। ইহা ফুসফুসের সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

১৬। অস্ত্র (নাড়ীভূঁড়ি)- শরীরের অভ্যন্তরে স্থিত। পুরুষদের অস্ত্র ৩২ হাত লম্বা, স্ত্রীলোকের অস্ত্র ২৮ হাত লম্বা এবং ২১ স্থানে ভাঁজ আছে। বর্ণ-শ্বেত বর্ণ, চুন ও বালির মিশ্রিত বর্ণ। সংস্থান-তৈল পাত্রে কুন্ডলীকারে স্থাপিত শীর্ষস্থিতি সাপের মত। দিশা-উভয় দিশাতে জাত। অবকাশ- উপরে গলাবাটক হতে নীচে মলদ্বার পর্যন্ত বিস্তারিত এবং গলাবাটক ও মলদ্বার দ্বারা সংস্থাপিত। পরিচ্ছেদ অস্ত্রভাগের দ্বারা পরিচ্ছন্ন। ইহা সভাগ পরিচ্ছন্ন। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

১৭। অস্ত্রগুণ (আতুড়ির পৈজকুন্ডলী)- শরীরের অভ্যন্তরে অস্ত্রকে স্থানে স্থানে ভাঁজ করে বন্ধন করে রাখে। বর্ণ- শ্বেতবর্ণ, জলপদ্মের ভোজ্য মূলের মত। সংস্থান- জল পদ্মের মূলের আকার। দিশা- উভয় দিশার জাত। অবকাশ-২১ টি ভাঁজ করে অস্ত্রগুণ অস্ত্রকে শক্তভাবে বন্ধন করে রাখে। উহা কোদল কুড়াল প্রভৃতি দিয়ে কাজ করার সময় যেখানে শক্তভাবে ধরা হয় সেভাবে অস্ত্রকে বন্ধন করে রাখে। যখন কাঠ ফলককে টানা হয় এটা যন্ত্রের রজ্জু যেভাবে কাঠফলককে বন্ধন করে রাখে অথবা পা মোহার জন্য পাপুসের পরিধির মধ্যে রজ্জু যেভাবে সেলাই করা হয় সেভাবে অস্ত্রকে বন্ধন করে রাখে। পরিচ্ছেদ-অস্ত্রগুণভাগ দ্বারা পরিচ্ছন্ন ইহা ইহার সভাগ পরীচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

১৮। উদর্য (উদরস্থ ভুক্তবস্তু)-উদরে স্থিত, ভুক্ত, পীত, চর্বিত এবং আত্মাদিত বস্তু। বর্ণ-যে খাদ্য গ্রহণ করা হয়েছে উহার বর্ণ। সংস্থান- কাপড়ে জল পরিস্রাবিত শিথিলবদ্ধ চাউলের আকার। দিশা-উপরি দিশায় জাত। অবকাশ-উদরে অবস্থান করে। উদর বা পাকস্থলী উপর ও নীচের দিকে নিপীড়নকে আর্দ্রবস্ত্রের যেভাবে স্ফীত করা যায় সেরূপ অস্ত্রের স্ফোটক আকার। উহার বাহিরে মসৃণ। ভিতরে বিবর্ণ আত্মপত্রে জড়ানো পঁচা মাংস এবং কসম্বু সদৃশ। ভিতরে প্রকৃতপক্ষে পঁচা কাঁঠালে চামড়ার মত। পাকস্থলীতে তককোটকো, গন্ডোৎপাদক, তালহীরক, সূচীমুখ, পটতল্লুক, সূত্রক (কেঁচোকুমি, গন্ডোৎপাদক কুমি তালতন্ত্র কুমি, সূচীমুখ কুমি, ফিতাকুমি, সূতাকুমি) প্রভৃতি ৩২ জাতের কুমি আকুল ব্যাকুল এবং দলে দলে বিচরণে করতঃ বাস করে। যখন উহাদের খাদ্য ও পানীয় অভাব দেখা দেয়, তখন উহারা উপর দিয়ে লাফায়ে উঠে এবং উহাদের বিচরণ হৃদয় মাংস অভিহনন করে। খাদ্য ও পানীয় গিলিবার সময় ইহারা উদ্ধমুখ হয়ে প্রথম গলাধকরণ করা দ্রব্যের ২/৩ ভাগ কেড়ে গিলে ফেলে। পাকস্থলী কুমিদের সূতিকাগর, বাহ্যকটি, চিকিৎসালয় এবং শাশান। গ্রীষ্মকালে যখন বর্ষা শুরু হয়, তখন নানা পুঁথি দুর্গন্ধ বস্তু যেমন মূত্র, গোবর, চর্ম, হাড়, মাংসতন্তুর টুকরা থুথু,

সিকনি, রক্ত জল প্রবাহে চড়াল কর্তৃক গ্রামের দ্বারপ্রান্তে স্থাপিত আবর্জনার স্তুপে পতিত হয়, উহা কর্দমাক্ত জলে ঘুরপাক খেতে থাকে। সেখানে দুই দিন পরে কৃমিকূলের উৎপত্তি হয়। উহা প্রস্ফুটিত হয়, সূর্যতাপের শক্তিতে উতপ্ত হয় এবং জলে উপরে ফেনা এবং বুদবুদ উৎপাদন করে। তারপর গাঢ় কাল হয়, উহারা দুর্গন্ধ ও অশুচি হয়। কেহ উহার নিকট যেতে বা উহাকে দেখতে চায় না। এমনকি উহা দুর্গন্ধ ও স্বাদ অসহ্য। পাকস্থলী যেখানে খাদ্য ও পানীয় সংগৃহীত হয়, দাঁত দিয়ে চর্বনের পর জিহ্বা দিয়ে টেলে লালার সহিত মিশ্রিত নিজস্ব বর্ণগন্ধ স্বাদ প্রভৃতি বিসর্জন দিয়ে সেখানে কোলেট আটার আকার ধারণ করে এবং কুকুরের বমির মত হয়। তারপর পিত্ত ও শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত হয়ে বায়ু উৎপন্ন হয়। উহা পাকস্থলীতেজ উষ্ণতার শক্তিতে উতপ্ত হয়। কৃমিকূলের সহিত ফুটতে থাকে। উপরি ভাগে ফেনা ও বুদবুদ হতে থাকে। তারপর উহা দুর্গন্ধযুক্ত উন্মাসিক বস্তুতে পরিণত হয়। যাহা চোখে পড়লেও না দেখা ইচ্ছা হয়। তাহার কথা শুনতে খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষুধা দূর হয়ে যায়। যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা হয়, তাহা পাকস্থলীতে পাঁচভাগে বিভক্ত হয়। কৃমি একভাগ গ্রহণ করে, একভাগ পাকস্থলীতে হজম হয়। একভাগ মূত্র হয়, একভাগ মল হয়ে বাহির হয় এবং একভাগ রস ভাব প্রাপ্ত হয়ে শোণিত মাংসাদি উপবর্ধন করে। পরিচ্ছেদ-উদার্য উদরীয় ভাগে পরিচ্ছন্ন ইহা সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

১৯। করীষ (বিষ্ঠা)- ইহাই মল। বর্ণ-সাধারণতঃ উহার বর্ণ অধঃকৃত খাদ্যের সদৃশ হয়ে থাকে। সংস্থান-যেখানে অবস্থান করে, সেইরূপ আকারে পরিণত হয়। দিশা-নিম্ন দিশার জাত। অবকাশ-মলাশয়ে স্থিত। মলাশয় অন্ত্রনালীর সর্বশেষ অংশের সকলের সর্ব নিম্নভাগ, উহা আট আঙ্গুল উচ্চতা বিশিষ্ট এবং নাভিমূল হতে মেরুদন্ডের মূল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা দেখতে বাঁশের অভ্যন্তরের মত। যেমন উচ্চ ভূমিভাবে পতিত বৃষ্টির জল গড়ায়ে নীচের ভূমিভাগ পূর্ণ করে থাকে, সেই রূপ ভোজ্য দ্রব্যাদি, যাহা ক্রমাগত পাকস্থলীর নিঃস্বরিত রসের সহিত সংমিশ্রিত ও ফেণিত যন্ত্রে মিশ্রিত নরম ময়দায় হয়ে অন্ত্রনালী দিয়ে গড়ায়ে মলাশয়ে পতিত হয়। এখানে এই ভূক্ত বস্তু বাঁশ নালীতে জমা হয়ে পিঙ্গল কয়লার মত হয়। পরিচ্ছেদ-মলাশয়ে করীষভাগের দ্বারা পরিচ্ছন্ন। ইহা ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

২০। মস্তিষ্ক - মাথার খুলির অভ্যন্তর স্থিত মজ্জারশি। বর্ণ-স্বেত বর্ণ, ব্যাঙের ছাতার পিত্ত সদৃশ। দধিতে পরিণত হওয়ার পূর্বে ক্ষার দুধের বর্ণ। সংস্থান- অবস্থান অনুযায়ী আকার ধারণ। দিশা- উপরি দিশায় জাত। অবকাশ- মাথার খুলির অভ্যন্তরে মাথার চারটা সেলাই স্বরূপ সংযোগের সহিত ময়দার জলমিশ্রিত পিঙ্গলের মত কোমল চার পিঙ্গে বিভক্ত। পরিচ্ছেদ-মস্তিষ্ক ভাগে পরিচ্ছন্ন। ইহা ইহার সভাগ পরিচ্ছেদ। বি সভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

২১। পিত্ত- শরীরের দুই প্রকার পিত্ত আছে। যথাঃ (১) বদ্ধ পিত্ত ও (২) অবদ্ধ পিত্ত। বর্ণ-বদ্ধ পিত্ত ঘন মধুক তৈলবর্ণ ও অবদ্ধ ম্লান আকুলি ফুলের বর্ণ। সংস্থান-

অবস্থান অনুযায়ী আকার ধারণ। দিশা-উভয় দিশার জাত। অবকাশ-অবদ্ধ পিত্ত কেশা-লোম-দন্ত-নখ, শক্ত শুষ্ক চর্ম ব্যতীত শরীরের অবশিষ্ট জলের ওপর তৈলবিন্দুর মত বিস্তৃত। অবদ্ধ পিত্ত ঘনীভূত হলে চোখ পীতবর্ণ হয়। শরীর কম্পিত হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিহরিত হয় ও চুলকায়। বদ্ধ পিত্ত হৃদয় ও ফুসফুসের মাঝখানে যকৃৎ মাংসের নিকট রক্তবর্ণ কোষাটকীর ডাটার মত পিত্তকোষে জমা থাকে। উহা কুপিত হলে লোকেরা উন্মত্ত হয়, বিপর্যস্ত চিন্তা হয়, লজ্জা-শরম ত্যাগ করে অকরণীয় কাজ করে, অপ্রয়োজনীয় কথা বলে এবং অচিন্তনীয় বিষয় চিন্তা করে। পরিচ্ছেদ- পিত্তভাগের দ্বারা পরিচ্ছন্ন। ইহা উহার সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

২২। শ্লেষ্মাঃ শরীরের অভ্যন্তরে এক পাত্তপূর্ণ শ্লেষ্মা আছে। বর্ণ-শ্বেত নাগবল্লুরী পাতার রসবর্ণ। সংস্থান- অবস্থান অনুযায়ী আকার ধারণ। দিশা-উপরি দিশায় জতি। অবকাশ-পাকস্থলীর ভিতরে ঝিল্লির উপর অবস্থিত। খাদ্য দ্রব্যাদি অধঃহরণ কালে যেমন জলে শৈবাল ও আগাছা কোন কাঠের টুকরা অথবা মাটির টুকরা পড়লে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পুনঃ একই স্তরে মিশে যায়, সেইরূপ পান ভোজনাদি নিপতিত হলে পাকস্থলীর ঝিল্লি দ্বিবিভক্ত হয়ে আবার একই স্তরে মিলিত হয়। কোন কারণে পাকস্থলীর শ্লেষ্মা অসুস্থ হয়ে পড়ে, পাকস্থলী অতি দুর্গন্ধযুক্ত হয়, বিশ্রী পোড়ার ন্যায় বা পঁচা মুরগীর ডিমের ন্যায় ঘৃণ্য দুর্গন্ধে অসহনীয় বস্তুতে পরিণত হয়। যখন এই দুর্গন্ধ পাকস্থলীতে উদ্গীরণ হয়, তখন উদ্গীরণ বায়ুতে মুখ অতিশয় বিরক্তিকর হয় এবং দূষিত বায়ু ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য লোকেরা এই অবস্থায় “দূর হও, তোমার নিশ্বাসে দুর্গন্ধ বাহির হচ্ছে” বলতে থাকে। এই দুর্গন্ধ আর ঘনীভূত হলে পায়খানা প্রসারিত কাষ্ঠখন্ডের মত পাকস্থলীর ঝিল্লি দুর্গন্ধযুক্ত হয়। পরিচ্ছেদ-শ্লেষ্মা ভাগের দ্বারা পরিচ্ছন্ন। ইহা উহার সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

২৩। পৃষ- বিধ্বসিত রক্ত হতে পৃষের সৃষ্টি হয়। বর্ণ- পরিকৃত পাতার বর্ণ সদৃশ। মৃত শরীরের বর্ণ ঘনপলি ফেনার মত। সংস্থান-অবস্থান অনুযায়ী সংস্থান। দিশা-উভয় দিশায় জাত। অবকাশ-পৃষের কোন নির্দিষ্ট অবকাশ নাই। যেখানে পৃষ সঞ্চিত হয়, সেখানে উহা অবস্থান করে। কাষ্ঠখন্ডে, কাঁটায়, প্রহারে, অগ্নিশিখায় প্রভৃতি কারণে আঘাত হলে অথবা গভ্র ফোড়া প্রভৃতি হলে রক্ত জমে পৃষে পরিণত হয়। পরিচ্ছেদ- পৃষ ভাগ দ্বারা পরিচ্ছন্ন। ইহা উহার সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

২৪। রক্ত-শরীরে দুইভাবে রক্ত অবস্থান করে। যথা-(১) সঞ্চিত রক্ত (২) সঞ্চরিত রক্ত। বর্ণ-সঞ্চিত রক্তের বর্ণ পাক করা লাক্ষা ঘন রসবর্ণ এবং সঞ্চরিত রক্তের বর্ণ লাক্ষার স্বচ্ছ রসবর্ণ। সংস্থান-উভয় প্রকার অবস্থান অনুযায়ী সংস্থান ধারণ করে। দিশা-সঞ্চিত রক্ত উপরি দিশায় জাত এবং সঞ্চরিত রক্ত উভয় দিশার জাত। অবকাশ-মাংস বিহীন শক্ত সুক্ষ চর্ম, কেশ, লোম, দাঁত ও নখ প্রভৃতি অংশ ছাড়া শরীরের শিরা-উপশিরা দিয়ে রক্ত সবস্থানে সঞ্চরিত হয়। সঞ্চিত রক্ত যকৃৎের অধঃস্থানে জমা থাকে এবং উহার পরিমাণ এক পাত্তের সমান। ওখান থেকে অল্প অল্প রক্ত হৃদয়, বৃক্ক,

ফুসফুসে গিয়ে উহাদিগকে ভিজায়ে রাখে। যদি এই রক্ত হৃদয়, বৃক্ক, প্রভৃতি বস্তু ভিজায়ে না রাখে, তবে মানুষেরা তৃষ্ণার্থ হয়। পরিচ্ছেদ- রক্ত ভাগের দ্বারা পরিচ্ছন্ন। উহার রক্তের সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশসদৃশ।

২৫। স্বেদ- লোমকূপাদি হতে নিঃসরিত জলীয় পদার্থ। বর্ণ- পরিষ্কার তিল তৈল বর্ণ। সংস্থান-অবস্থান অনুযায়ী। দিশা-উভয় দিশায় জাত। অবকাশ- নির্দিষ্ট অবকাশ নাই। রক্তের মত সব স্থানে অবস্থান করে। কিন্তু যখন অগ্নিতাপ, সূর্যতাপ, আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রভৃতি পরিস্থিতিতে শরীর সন্তাপিত হয়, তখন কেশকূপ এবং লোমকূপ হতে অমসৃণ ভাবে কথিত শাপলা মৃণাল এবং পদ্ম মৃণাল হতে যেভাবে পানি বের হয় সেভাবে শরীর হতে স্বেদ নির্গত হয়। সুতরাং উহার অবকাশ কেশকূপ ও লোমকূপের ছিদ্র সদৃশ। সুতরাং স্বেদের সংস্থান কেশ লোমকূপের ছিদ্রের মত জানতে হবে। পরিচ্ছেদ- স্বেদভাগে পরিচ্ছন্ন। ইহা উহার সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

২৬। মেদ- শরীরের মাংস ও চামড়ার মধ্যে অবস্থিত চর্বি। বর্ণ- ফালিত হলুদের রং। সংস্থান-অবস্থান অনুযায়ী সংস্থান। স্থূল শরীরে মেদ চামড়া ও মাংসের মধ্যে খানে বিস্তারিত থাকে। মেদ হলুদ দ্বারা রঞ্জিত দুকূল কাপড়ের টুকরার মত। কৃশ শরীরে জন্ডঘা মাংস, উরুমাংস পীঠের হাঁড় প্রভৃতি স্থানে ২/৩ ভাঁজ স্থাপিত করে হলুদ বর্ণে দুকূল কাপড়ের আকার ধারণ করে। দিশা-উভয় দিশার জাত। অবকাশ- স্থূল শরীরে ক্ষুরণ করে সবস্থানে ব্যাপী জুড়ে থাকে। কৃশ শরীরের জন্ডঘা মাংসাদিতে নিশ্রয় করে থাকে। ইহা স্নেহ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হলে ও পরম ঘৃণ্যবলে মাধায় দেবার তৈলের জন্যও নাকে ব্যবহার তৈলের জন্য ও গ্রহণ করা হয় না। পরিচ্ছেদ-ইহা নীচে মাংস উপরে চামড়া এবং তির্যক মেদ ভাগ দ্বারা পরিচ্ছন্ন।-ইহা সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

২৭। অশ্রু- চক্ষু হতে নিঃসরিত জলীয় পদার্থ। বর্ণ-পরিষ্কার তিল তৈল বর্ণ। সংস্থান অবস্থান অনুযায়ী। দিশা- উপরি দিশায় জাত। অবকাশ- অক্ষিকূপ মধ্যে সীমাবদ্ধ। অশ্রু পিত্তকোষের পিত্তের ন্যায় চক্ষু কূপে সব সময় সঞ্চিত থাকে না। যখন মানুষ সৌম্যনস্য জাত মহা-হাসি হাসে, দৌর্ম্যনস্য জাত রোদন করে, পরিদেবন করে অথবা বিষম আহার আহার করে অথবা যখন ধূমা, ধূলা, ময়লা প্রভৃতি দ্বারা চক্ষু আক্রান্ত হয়, তখন আনন্দে, দুঃখে অথবা বিষম আহারে অশ্রু অক্ষিকূপে পূর্ণ হয়ে যায় এবং উহাকে প্রাবিত করে দেয়। পরিচ্ছেদ- অশ্রুভাগ দিয়ে পরিচ্ছন্ন। ইহা অশ্রুর সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগপরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

২৮। বসা-বিগলিত স্নেহ জাতীয় পদার্থ। বর্ণ- নারিকেল তৈল বর্ণ। সংস্থান-অবস্থান অনুযায়ী। দিশা-উভয় দিশায় জাত। অবকাশ- হস্ততল হস্তপৃষ্ঠ, পদতল, পদপৃষ্ঠ, নাসাপৃষ্ঠ, ললাট কাঁধ শীর্ষে অবস্থান করে। ইহা এই সকল স্থানে সব সময় বিগলিত অবস্থায় থাকে না। অগ্নি তাপে, সূর্য তাপে আবহাওয়ার পরিবর্তনে অথবা ধাতুসমূহের বিপর্যয়ে ইহা উতগু হয়ে বিগলিত হয় এবং সেখানে স্নান সময়ে পরিষ্কার

জলে উপর তৈল বিন্দুর মত সঞ্চারণ করতে থাকে। পরিচ্ছেদ- বসা ভাগের দ্বারা পরিচ্ছন্ন। ইহা উহার সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

২৯। থুথু-মুখের অভ্যন্তরে ফেনিল জলীয় পদার্থ। বর্ণ-শ্বেত ফেনবর্ণ। সংস্থান- অবস্থান অনুযায়ী সংস্থান। ফেন সংস্থান বলেও বলা যায়। দিশা-উপরি দিশার জাত। অবকাশ-উভয় গালের ভিতরের প্রাচীর হতে থুথু নির্গত হয়ে জিহ্বার উপর স্থিত থাকে। সব সময় থুথু জমা হয় না। যখন মানুষ ভোজ্য দ্রব্য দেখে বা তাহা সম্বন্ধে স্মরণ করে অথবা কোন উষ্ণ-তিক্ত-কটু-লবনাক্ত, টক বস্তু মুখে স্থাপন, এবং হৃদয় পীড়িত হলে অথবা কিছুতে জুগুসা উৎপন্ন হলে গালের ভিতরের প্রাচীর হতে থুথু উৎপন্ন হয়ে নেমে আসে এবং জিহ্বার উপর সংস্থাপিত হয়। উহা জিহ্বার অগ্রভাগে পাতলা এবং জিহ্বা মূল ভাগে ঘন থাকে। যেমন নদী বালুকতীরে কূপ খনন করা হলে উহা কখনও জলবিহীন হয় না, সেরূপ মুখে প্রক্ষিপ্ত শস্যকণা অথবা চাউল বা চর্বনযোগ্য খাদ্যবস্তু ভিজাতে থুথু সব সময় প্রস্তুত থাকে। পরিচ্ছেদ-থুথু ভাগ দ্বারা পরিচ্ছেদ বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

৩০। সিখনী-মস্তিষ্ক হতে নিঃসৃত অশুচী তরল পদার্থ। বর্ণ- অপক্ক তালের বীজের মজ্জার মত। সংস্থান-অবস্থান অনুযায়ী। দিশা-উপরি দিশায় জাত। অবকাশ- নাকের ছিদ্র দ্বয় পূর্ণ করে স্থিত থাকে। সিখনী সব সময় নাকে ছিদ্রে জমা থাকে না। কিন্তু যেমন কোন ব্যক্তি পদ্মপত্রের দধি বেঁধে নীচে কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করলে এই কাঁটার ছিদ্র দিয়ে দধি গলে বাহির হয়ে আসে সেই রূপ কোন ব্যক্তি রোদন করলে অথবা দুষিত খাদ্য খেলে বা ঋতু পরিবর্তনে মস্তিষ্কে শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং উহা মস্তিষ্ক হতে পৃষ শ্লেষ্মা ভাব প্রাপ্ত হয়ে তালু মস্তক বিবর পথে অবতরণ করে নাসারন্ধ্রে জমা হয় এবং ওখান হতে প্রবাহিত হতে থাকে। পরিচ্ছেদ-সিখনীভাবে পরিচ্ছন্ন, ইহা ইহার বিসভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

৩১। লসিকা- শরীরের অস্থিসন্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত পিচ্ছিল তৈল জাতীয় পদার্থ। বর্ণ-কর্ণিকার নির্ঘাস বর্ণ। সংস্থান-অবস্থান অনুযায়ী। দিশা- উভয় দিশায় জাত। অবকাশ- একশত আশিটি অস্থি সন্ধির অভ্যন্তরে স্থিত থাকে। অস্থি গ্রন্থির পিচ্ছিল করা কাজ করে। লসিকার পরিমাণ যে ব্যক্তির অস্থিগ্রন্থিতে কমতি হয়, তার উঠতে, বসতে অতিক্রম করতে, প্রতিক্রম করতে, সংকোচন করতে, প্রসার করতে অস্থি সমূহ কট কট করে, অঙ্গুলি আঘাত করার মত শব্দ করে। এক যোজন পথ অতিক্রম করতে বায়ু কুপিত হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যথা গুরু হয়। লসিকা যাদের গ্রন্থিতে বহুল পরিমাণে থাকে, উঠতে বসতে তাদের অস্থিসমূহ কট কট করে না। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলেও বায়ু কুপিত হয় না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যথা অনুভব করে না। পরিচ্ছেদ-লসিকা-ভাগে পরিচ্ছন্ন। ইহা সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

৩২। মূত্র-মূত্রাশয়ে সঞ্চিত থাকে। বর্ণ-মাষ কলাইয়ের ক্ষাত্তরের জল রং। সংস্থান- অধোমুখ স্থাপিত জলপত্রের অভ্যন্তরের জলের আকার। দিশা- নীচের দিশায় জাত।

অবকাশ-মূত্রাশয়ে স্থিত থাকে। মূত্রাশয়কে মুত্রথলি ও বলা হয়। যেমন মুখ বিহীন ছিদ্রযুক্ত কলসী একটা জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত করলে ছিদ্র দিয়ে জল কলসীতে প্রবেশ করে। কিন্তু জলের প্রবেশ পথ প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান নহে, সেই রূপ শরীর হতে মূত্র মূত্রাশয়ে এসে সঞ্চিত হয়। কিন্তু মূত্র নিগত হওয়ার পথ দেখা যায়। যখন মূত্র এসে মূত্রাশয় পূর্ণ হয় উহা প্রকোপিত করে, তখন মানুষের মূত্রাশয় খালি করার জন্য মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হয়। পরিচ্ছেদ- মূত্রাশয়ের অভ্যন্তরে মুত্রভাগ দ্বারা পরিচ্ছন্ন। ইহা উহার সভাগ পরিচ্ছেদ। বিসভাগ পরিচ্ছেদ কেশ সদৃশ।

এই ৩২ প্রকার অণুটি দ্রব্য বৌদ্ধ সাহিত্যে ভাবনার একটা বিশেষ দিক হিসাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাই এই ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে মানুষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিকে প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের পরিবর্তন, পরিপাচন ও নিঃসরণ চিন্তায় চেতনায় আনতে পারলে এই দেহকে অপবিত্র, অগ্রহণীয় ও অণুটি বস্তু বলে মনে হয়। এখানে যদিও মানব দেহের কতগুলি তন্ত্র বা **Systems (Suchas-Endocrine System, reproductive System etc)**-এর উল্লেখ নাই, এই সব তন্ত্র বৌদ্ধ ধারণা মতে এইরূপ অণুটি এবং অগ্রহণীয়। এই অণুটি সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য আমরা “খুন্দক পাঠের” অটঠকথা ‘পরমার্থ জ্যোতিকার প্রকীর্ণ পদ্ধতির” উল্লেখ করতছি।

প্রকীর্ণ পদ্ধতি

এখানে এখন দ্বাত্রিংশ প্রকার অণুটি দ্রব্যের পরিপূর্ণ পরিচিতির জন্য উহাদের দেব বিস্তৃত জানা উচিত।

“নিমিত্তো লক্ষণতো ধাতুতো সুঞঞতো পিচ

স্ফাদিতো চ বিঞঞ যয়ো দ্বত্তিং সাকার নিচ্ছয়োতি”।

বহ্নানুবাদঃ নিমিত্ত-লক্ষণ-ধাতু-শূন্যতা-স্ফাদি বশে দ্বাত্রিংশ অণুটি দ্রব্যের আলোচনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য উত্থাপন করছি।

(ক) এখানে নিমিত্ত দিয়ে ৩২ প্রকার অণুটি দ্রব্যকে ১৬০ প্রকার নিমিত্ত প্রকাশ পাচ্ছে। ভাবনাকারী ৩২ প্রকার অণুটি দ্রব্যের মধ্যে কেশের বর্ণ-সংস্থা-দিশা-অবকাশ-পরিচ্ছেদ বশে আলোকন করেন। এইভাবে লোমে প্রভৃতি দ্রব্যকে ও অবলোকন করতে থাকেন।

(খ) লক্ষণবলতে ৩২ প্রকার অণুটি দ্রব্যের ১২৮ প্রকার বিশেষ লক্ষণ বুঝায়। ভাবনাকারী ৩২ প্রকার অণুটি দ্রব্যের মধ্যে কেশের কাঠিন্য লক্ষণ, আবদ্ধন লক্ষণ, উষ্ণলক্ষণ ও গতি লক্ষণ বশে লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দিতে থাকেন। এইভাবে লোম প্রভৃতিতে যোগীকে মনোযোগ দিতে হয়।

(গ) ধাতু বলতে এখানে চারি প্রকার মহাভূত রূপকে বুঝাচ্ছে। এই ৩২ প্রকার অণুটি দ্রব্যের ১২৮ প্রকার ধাতু আছে। ভাবনাকারী এই ৩২ প্রকার অণুটি দ্রব্যের

কেশের কাঠিন্যকে পৃথিবী ধাতু, কেশের সংযুক্তি বা আবন্ধনকে আপ ধাতু, কেশের পরিপাচনকে তেজধাতু, বিখ্যাততা বা বিস্তৃতিকে বায়ু ধাতু রূপে অবলোকন করেন।

(ঘ) শূন্যতা বলতে ৩২ প্রকার অণুচি দ্রব্যের ১২৮ প্রকার শূন্যতা বুঝাচ্ছে। ভাবনাকারী ৩২ প্রকার অণুচি দ্রব্যে শূন্যতার দ্বারা প্রজ্ঞা অর্জন করেন। যেমন কেশে পৃথিবী ধাতুতে আপ ধাতু এবং অন্যান্য ধাতু শূন্য থাকে। সেরূপ আপ ধাতুতে পৃথিবী ও অন্যান্য ধাতু শূন্য থাকে।

(ঙ) ঋদ্ধাদি বিষয়- ৩২ প্রকার অণুচি দ্রব্যের যখন কেশ প্রভৃতি ঋদ্ধাদিবশে বিবেচনা করা হয়, তখন প্রথমে হতে এইরূপ ধারণা উৎপন্ন হয় পঞ্চ ঋদ্ধে (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) কেশ কতগুলি ঋদ্ধ প্রকাশ করে? কেশ আয়তনের (১২ আয়তন) কতগুলি আয়তনকে প্রকাশ করে? ধাতুর (১৮ প্রকার ধাতু) কতগুলি ধাতুকে প্রকাশ করে? সত্যের (চার সত্য) কতগুলি সত্যকে প্রকাশ করে? স্মৃতি প্রস্থানের (৪ স্মৃতি প্রস্থান) কতগুলি স্মৃতি প্রস্থানকে প্রকাশ করে? যখন ভাবনাকারী এইভাবে বুঝতে পারে, তখন দেহকে তৃণ কাষ্ঠের স্থূপ মনে হয়।

“ন’ অধি সন্তো নরের পেসো, পুগগলো নুপলব্ধতি,

সুঞ্জ্জুতো অয়ং কায়ো তিণকট্ট সমুপমো তি।”

বহ্নানুবাদঃ সত্ত্ব, নর ও মানুষ বলতে কিছু নাই। পুদগল বলতে কোন উপলব্ধি নাই, এই দেহ তৃণ কাষ্ঠের স্থূপের মত শূন্য।

তখন ভাবনাকারী এক অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করে ভাবতে থাকেন-

“সুঞ্জ্জাগারং পবিট্টস্স সন্তচিস্ত তদিনো

অমানুসীরতী হোতি সন্মা ধম্মং বিপস্স তো’তি।” (ধম্মপদ-৩৭৩)

বহ্নানুবাদঃ তিনি প্রশান্ত চিন্তে নির্জন স্থানে প্রবেশ করেন (তিনি নির্জন স্থানে ধ্যানপ্রিয় হন) এবং তিনি সম্যক ধর্ম বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়ে দিব্য (অমানুষিক) সুখ অনুভব করেন।

এইভাবে অতিমানবিক সুখে রত হয়ে, তিনি (পরজন্ম ক্ষীণ কারী) জ্ঞান অর্জন করেন। (অদৃঢ় করো, অদূর করো)। তখন তাঁর মনে হয়-

“যতো যতো সন্মস্সতি ঋদ্ধানং উদয়ব্যয়ং,

লভতে পীতিপামুজ্জং, অমতং তং বিজানতং তি”। (ধম্মপদ - ৩৭৪)

বহ্নানুবাদঃ তিনি ঋদ্ধ সমূহের উদয় ব্যয় বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি নির্বাণ পরিজ্ঞাত হয়ে প্রীতি ও প্রাসাদ্য লাভ করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে মানবদেহ সম্বন্ধে সে সকল প্রসঙ্গ এসেছে, তাহা বৌদ্ধদের পরম ও চরম লক্ষ্য সাংসারিক দুঃখ মুক্তির উপায়কে কেন্দ্র করে। তাই এই ৩২ প্রকার অণুচি সম্বন্ধে স্মৃতি প্রস্থানে কায় গতাস্থতি নামে মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাবনার বিষয় আলোচিত হওয়ায়

আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক শারীরিক গঠনও কার্যকলাপের সূত্রপাত করার কোন যুক্তি সম্ভব কারণ নাই। আমরা শুধু বৌদ্ধ সাহিত্যে মানবদেহ সম্বন্ধে যে প্রসঙ্গ এসেছে, তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করে উল্লেখ করছি।

জগতোৎপত্তি সহিত রোগসম্পর্ক

মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পর এই শরীরের উৎপত্তির উৎস বা বৌদ্ধ মতে রূপের সমুখান সম্বন্ধে আলোকপাত করলে রোগের নিদান, রোগের উপসর্গ ও লক্ষণ (Signs & Symptoms) এবং রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা কিভাবে করা হয় তাহা সম্যক ভাবে মূল্যায়ণ করতে সমর্থ হব। তাই প্রথমে আমরা বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত জগত বিবর্তনের সাথে সাথে সত্ত্বদের জগতে আবির্ভাবের তথ্য উদ্ধার করতে প্রয়াসী হবো। এখন আমরা দীর্ঘনিকায় গ্রন্থে “অগ্গঞঞ” সূত্র হতে উদ্ধৃতি দিচ্ছি-

১০। বাসেট্ট, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিংবা কালই হউক দীর্ঘকাল অতীত হবার পর এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়। এই সময় জীবগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর জগতে পূর্ণ জন্ম লাভ করে। তারা তথায় মনোময় হয়ে থাকে। প্রীতি তাদের ভক্ষ্য স্বরূপ হয়। তারা স্বয়ং প্রভ, অন্তরীক্ষচর ও শুভস্থায়ী হয়ে সুদীর্ঘ কাল অবস্থান করে।

বাসেটি, এমন সময় আসে যখন আজই হউক কিংবা কাল হউক, দীর্ঘকাল অতীত হবার পর এই জগতের বিবর্তন হয়। এই বিবর্তন কালে সত্ত্বগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বরকায় হতে চ্যুত হয়ে এই জগতে আবির্ভূত হয়। তারা মনোময় হয়ে থাকে। প্রীতি তাদের ভক্ষ্য স্বরূপ হয়, তারা স্বয়ং প্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হয়ে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

১১। বাসেট্ট, তখন সমস্ত পৃথিবী জলময় ও অন্ধকার হয়, তমিস্র অন্ধকারক হয়। চন্দ্রসূর্যের আবির্ভাব হয় না, নক্ষত্র তারকাদির প্রকাশ হয় না, দিবারাত্রি নাই, মাসার্ধ ও মাস নাই, ঋতু এবং সংবৎসর নাই, স্ত্রীও নাই পুরুষ ও নাই। সত্ত্বগণ সত্ত্বরূপেই গণিত হয়। বাসেট্ট, এভাবে দীর্ঘকাল অতীত হবার পর এমন সময় আসে যখন এই সকল সত্ত্বের নিকট জলোপরি রস সংযুক্ত পৃথিবী বিস্তৃত হল। যেরূপ উত্তপ্ত দুগ্ধ শীতলীভূত হবার কালে উহার উপর শর বিস্তৃত হয়। সেরূপ পৃথিবীর আবির্ভাব হল। উহা বর্ণ গন্ধ রস সম্পন্ন হল। উত্তমরূপে সম্পাদিত ঘৃত অথবা নবনীত যেরূপ হয়, সেরূপ বর্ণ সম্পন্ন হল। বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা, মধুর ন্যায় আশ্বাদ সম্পন্ন হল।

১২। অনন্তর বাসেট্ট, কোন লোভ প্রকৃতি সম্পন্ন সত্ত্ব “দেখি ইহা কি হতে পারে?” কহে অঙ্গুলির সাহায্যে রস সংযুক্ত মৃত্তিকা আশ্বাদ করল, উহার ফলে সে রসাবিভূত হল এবং তার তৃষ্ণা উৎপন্ন হল। অন্য প্রাণীগণ ও উক্ত সত্ত্বের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে রস মৃত্তিকা অঙ্গুলির দ্বারা আশ্বাদ করল। তারাও রসাবিভূত হয়ে তৃষ্ণার দ্বারা আক্রান্ত হল। তারপর বাসেট্ট, ঐসত্ত্ব হাত দিয়ে রস মৃত্তিকা হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড

বিচ্ছিন্ন করে উহা আহার করতে আরম্ভ করল। উহার ফলে এই সকল সত্ত্বের স্বয়ংপ্রভা অন্তর্হিত হল। স্বয়ং প্রভার অন্তর্ধানের সহিত চন্দ্র সূর্যের আবির্ভাব হল। চন্দ্রসূর্যের আবির্ভাবের সহিত নক্ষত্রসমূহ ও তারকা গণের আবির্ভাব হল। দিবা রাত্রির প্রকাশ হল। সাথে সাথে মাসার্ধ, মাস, ঋতু এবং সংবৎসরের প্রকাশ হল। বাসেট্ট, জগতের পুনরায়-এইভাবে বিবর্তন হল।

১৩। তৎপর বাসেট্ট এই সকল সত্ত্ব রস মৃত্তিকা উপভোগ করে মৃত্তিকা ভোজী হয়ে উহাতে পুষ্ট হয়ে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করল। যে পরিমাণে তারা এইভাবে পুষ্ট হল সে পরিমাণে তাদের দেহ কঠিনতত্ত্ব প্রাপ্ত হল এবং তাদের বর্ণ ও বৈচিত্র্য প্রকাশ পেল। কোন সত্ত্ব সুরূপ হল। কোন সত্ত্ব কুরূপ হল। এস্থলে যারা সুরূপ হল তারা কুরূপদের অবজ্ঞা করল-“আমরা এই সকল সত্ত্ব অপেক্ষা সুরূপ। ইহারা আমাদের অপেক্ষা কুরূপ।” এই সকল গর্বিত ও অহামিকা সম্পন্ন প্রাণীগণের বর্ণাভিমান হেতু রসমৃত্তিকা অন্তর্হিত হল। রস মৃত্তিকা অন্তর্ধানের পর তারা একত্রিত হয়ে বিলাপ করল-“হায় রস, হায় রস,” বর্তমানে ও মনুষ্যগণ কোন স্বাদু রস লাভ করে এইরূপ কহে থাকে-“অহো রস, অহো রস।” তারা পুরাণ আদিম বাক্যেরই অনুসরণ করে। কিন্তু উহার অর্থ অবগত নয়।”

অগ্গংগ্গ সূক্তের পরবর্তী আলোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। রস মৃত্তিকা অন্তর্ধানের পর ভূমি পর্বটের আবির্ভাব হয়, সত্ত্বগণ উহা গ্রহণ করে দেহের আরও কঠিনতত্ত্ব প্রাপ্তের সাথে সাথে রূপেরও তফাৎ হল। তাতে তাদের মধ্যে সুরূপ ও কুরূপ নিয়ে অহংকার ও দ্বিষ্কার সৃষ্টি হল। সত্ত্বগণের বর্ণাভিমানে ভূমিপর্বটে অন্তর্হিত হল। তৎপর এক প্রকার বদলতার উৎপত্তি হল। উহা গ্রহণ করে সত্ত্বগণ আরও কঠিনতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে বর্ণ বৈচিত্র্যের অধিকারী হল। বদলতার অন্তর্ধানের পর কনহীন, তুষবিহীন। সুগন্ধ সালিতডুল ভূমি হতে উদগত হল। এই সালিতডুল গ্রহণ করে সত্ত্বগণের কাঠিন্য বৃদ্ধি পেল এবং তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের লক্ষণ গুলি প্রকাশ পেল। তাতে স্ত্রী-পুরুষেরা পরস্পরের প্রতি আসক্ত হল। তাতে তাদের মধ্যে রাগের উৎপত্তি হল। রাগের ফলে এক প্রদাহের সৃষ্টি হল। এই প্রদাহের প্রভাবে সত্ত্বগণ মৈথুন ধর্মের সেবা করল। যারা মৈথুন ধর্মের সেবা করল, তারা অন্যদের দ্বারা দ্বিকৃত হল। এই ধর্ম গোপনে করার জন্য তারা গৃহ নির্মাণ করল। তারা ভূমি হতে সালিতডুল এনে গৃহে সঞ্চিত করল। তাতে সালি কনবদ্ধ ও তুষবদ্ধ হল। সে স্থান সালি হতে সংগৃহীত হল সে স্থানে পুনরায় সালি উৎপন্ন হল না উৎপাতনের স্থান প্রকাশ হল। সালি স্থানসমূহ গুল্মাকারে অবস্থান করল। তাতে সত্ত্বগণ সালি ক্ষেত্র বিভক্ত করে সীমা নির্দেশ করল। তাতে একে অন্যের সীমা হতে সালি উপভোগ করতে লাগল। অন্যের সীমা হতে সালিগ্রহণকারী কে চোর বলে চিহ্নিত করা হল। চোরকে দণ্ড প্রয়োগের ব্যবস্থা হল। তখন সত্ত্বগণ তাদের মধ্যে এক সত্ত্ব যিনি অপেক্ষাকৃত অভিরূপ, দর্শনীয় প্রাসাদিক এবং মহাশক্তিশালী তাকে চুরির বিচার, মিথ্যাবলা শাস্তি এবং নির্বাসন করার ক্ষমতা দিয়ে সালির অংশ প্রদান করল। মহাজন নির্বাচিত বলে তাকে ‘মহাসম্মত’ এবং ক্ষেত্রের পতি বসে “ক্ষত্রিয়” নামে অভিহিত

করল। তৎমধ্যে যারা অরণ্যে কুটির নির্মাণ করে ধ্যান সাধনায় নিমগ্ন ছিল, তাকে ধ্যায়ী বলে অভিহিত করল। যারা ধ্যান সম্পন্ন হতে অসমর্থ তারা গ্রাম ও নিগম সমূহের নিকট স্থানে গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্ত হল। তারা অধ্যায়ক ও বর্তমানে জাতিগত ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হল। যারা বিভিন্ন ব্যবসায় নিয়ত হল, তারা বৈশ্য নামে অভিহিত হল। বাকী রুদ্রাচার সম্পন্ন সন্তগণ শূদ্র নামে কথিত হল। এইভাবে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়। এই সূত্রে হতে প্রতীয়মান যে সন্তগণ প্রথমে মনোময় হয়ে প্রীতি ভক্ষ্য স্বরূপ গ্রহণ করে স্বয়ং প্রভায় অন্তরীচক্ষে বিচরণ করত। জগত বিবর্তনের সাথে সাথে জগতের কঠিনত্ব প্রাপ্তির সহিত সংগতি রেখে তাদেরও কঠিনত্ব প্রকাশিত হয়। পূর্ব জন্মার্জিত কর্ম প্রভাবে তাদের মধ্যে কুশলাকুশল কর্মের বিপাক সৃষ্টি হয়। স্বভাবতঃ অকুশল কর্মের দ্বারা প্রভাবিত সন্তগণ কাম ক্রোধ মোহের প্রভাবে শরীর বিবর্তনের সাথে রোগের দ্বারা আক্রান্ত হল।

এখানে আমরা সুত্তনিপাতের ব্রাহ্মণ ধার্মিক সুত্তের উদ্ধৃতি দিয়ে বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখিত রোগ উৎপন্ন তথ্য প্রদান করব। সুত্তে উল্লেখ আছে সে এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন অনাথগিণ্ডকের আরামে অবস্থান করতেন। সেই সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক প্রশ্ন করেছিলেন,- ‘বর্তমান ব্রাহ্মণের সহিত প্রাচীন ব্রাহ্মণদের নিয়মাবলীর তফাৎ কোথায়’? উত্তরে ভগবান বুদ্ধ বলেন- “পূর্বে ব্রাহ্মণগণ সংযত ও তপস্বী ছিলেন, তারা সংসার ত্যাগ করে নিজের মঙ্গলের জন্য ধ্যানমগ্ন থাকার জন্য অরণ্যে কুটিরে অবস্থান করতেন এবং সাংসারিক ভোগ বিলাস হতে দূরে থাকতেন। তখন তাদের মধ্যে ইচ্ছা, অনশন ও জরা প্রভৃতি তিনটি রোগ ছিল। পরে ব্রাহ্মণ সালংকরা ভাষ্যা গ্রহণ করতে লাগলেন এবং গোমাংস ভক্ষণ শুরু করেন। তখন থেকে তাদের মধ্যে ৯৮ প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

“তয়ো রোগা পুরে আসং, ইচ্ছা অনসনং জরা,

পসুনঞ্চ সমরাস্তা, অটঠান ব্রুতি মাগসুং।”

সুত্ত নিপাত ব্রাহ্মণ ধম্ম সুত্ত—৩১৩

বহানুবাদঃ “পূর্বে তিন প্রকার রোগ ছিল। যথা-ইচ্ছা অনশন ও-জরা, পশুবধের সময় হতে তাদের মধ্যে আটানকই প্রকার রোগের সৃষ্টি হল। আমরা এখন সন্তদের জীবন সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করবো। বৌদ্ধ সাহিত্যে সত্ত্বের জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-(১) প্রবর্তনকাল ও (২) প্রতিসন্ধিকাল। কোন সত্ত্বের প্রতিসন্ধির পরবর্তীক্ষণ হতে ভবের চ্যুতি ক্ষণ পর্যন্ত প্রবর্তন কাল এবং চ্যুতির ক্ষণের পরবর্তী প্রতিসন্ধিক্ষণ পর্যন্ত প্রতিসন্ধিকাল। প্রবর্তনকালে সত্ত্বের চিন্তা চৈতসিকের আলম্বন যুক্ত হওয়ার সত্ত্বের চিন্তা বীথিয়ুক্ত থাকে। প্রতিসন্ধি কালে চিন্তা বীথিমুক্ত। এই দুই কালের মধ্যে সত্ত্ব পরিনিবৃত্ত না পাওয়া পর্যন্ত একত্রিশ ভূমির যে কোন একটা ভূমিতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তারা নিজের কর্মের বিপাক অনুযায়ী এই ভূমিতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তবে

যারা 'একত্রিশ ভূমির মধ্যে কাম, রূপ ও অসংজ্ঞ সত্ত্ব লোকে উৎপন্ন হয়, তাদের প্রতি সন্ধি ও প্রবর্তনকালীন রূপোৎপত্তিই রূপের উৎপত্তিক্রম। এখানে আমাদের প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সত্ত্বগণ চার প্রকারে উৎপত্তি হয়। যথা- (১) অণুজ (২) সংশ্বেদজ (৩) জরায়ুজ এবং (৪) ঔপপাতিক।

মধ্যমনিকায়ের মহাসীহ নাদসুন্তে বুদ্ধ বলেছেন-

“চতস্রো খো ইমা সারিপুত্ত যোনি যো। কতমা চতস্রঃ অভজা যোনি, জলাবুজা যোনি, সংসেদজা যোনি, ওপপাতিকা যোনীতি”। পক্ষী সরীসৃপ মৎস্য প্রভৃতি অণুজ; মানুষ; পশু প্রভৃতি জলাবুজ; পচা শবদেহে পচাজলে বৃক্ষতৃকে, পুষ্পফলাদিতে যে কীট উৎপন্ন হয় তাহা সংশ্বেদজ। উৎপত্তিক্রমে পরিপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিসহ পুনাবয়বে উৎপন্ন সত্ত্বের নাম উপপাতিক।

আমরা রূপের উপাদান সম্বন্ধে আলোকপাত করবো। রূপের উপাদানকে দুইভাবে ভাগ করা যায়। যথা (১) চার মহাভূত রূপ ও (২) এই চার মহাভূতোৎপন্ন রূপ। চারমহাভূত রূপ-পৃথিবী ধাতু, আপ ধাতু, তেজ ধাতু ও বায়ু ধাতু। অভিধর্মে এই চার মহাভূত রূপের বিশেষ অর্থ জড় পদার্থের গুণাবলী। পৃথিবী ধাতু জড় পদার্থের বিস্তৃতি ও কঠিনতা কোমলতা গুণের অর্থ বুঝায়। সেরূপ আপ ধাতু জড়ের সংসক্তি, তেজ ধাতু জড়ে তাপ এবং বায়ু ধাতু জড়ের গতি গুণ বুঝায়। জড়ের মৌলিক চার গুণ হতে বাকী ২৪ প্রকার রূপ উৎপন্ন হয়। রূপের সমুখানে কর্ম, চিন্তা, ঋতু ও আহারে বিশেষ ভূমিকা আছে এবং উহাদের প্রভাবে রূপের অবস্থান্তর ও ঘটে। রূপের এই অবস্থান্তর মধ্যে আমরা কতগুলি লক্ষণ প্রত্যক্ষ করি। উহাদিগকে লক্ষণ রূপ বলা হয়। লক্ষণ রূপ চার প্রকার। যথা- উপচয়, সন্ততি, জরতা ও অনিত্যতা। প্রতিসন্ধির পরক্ষণ হতে শরীরের ক্রমিক গঠনকে উপচয় বলা হয়। পূর্ণ গঠনকে পর জড়ের প্রবাহমান অবস্থাকে সন্ততি বলা হয়। তারপর শরীরের ক্রম পতন হতে থাকে। এই পতনাবস্থাকে জরতা বলা হয়। পতন অবস্থায় একসময়ে শরীরের বিলোপ হয়। এই বিলোপ প্রাপ্তি মৃত্যু বলে জড়ের অনিত্যতা লক্ষণ বলা হয়। মৃত্যু চার কারণে সংঘটিত হয়। যথা-(১) আয়ুক্ষয়, (২) কর্মক্ষয়, (৩) আয়ু-কর্ম উভয় ক্ষয় এবং (৪) উপচ্ছেদ মৃত্যু। সত্ত্ব যে ভূমিতে অবস্থান করে সেই ভূমির সত্ত্বদের দীর্ঘতম আয়ুর পরে মৃত্যুকে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যু বলা হয়। সত্ত্ব সে কর্মপ্রভাবে জন্ম গ্রহণ করেছে, সেই কর্ম প্রদত্ত শক্তির হ্রাস প্রাপ্ত হলে সত্ত্বের দেহান্তর হয়। উহাকে কর্মক্ষয়ে মৃত্যু বলে। আয়ু ও কর্ম উভয় ক্ষয়ে অপরিণত বয়সে মৃত্যুকে উভয় ক্ষয়ে মৃত্যু বলা হয়। আয়ু ও কর্ম উভয়ের শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বে কোন বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে মৃত্যু হলে উপচ্ছেদক কর্ম মৃত্যু বলা হয়। আট প্রকারের উপচ্ছেদক মৃত্যু হয়। যথা-(১) বাত, (২) পিত্ত, (৩) শ্লেষ্মাজনিত ব্যাধি, (৪) সন্নিপাত জনিত ব্যাধি (৫) বহিঃপ্রকৃতি হতে উৎপন্ন বিপত্তি (ভূকম্প, বজ্র, ঝড়, বৃষ্টি যানভঙ্গ প্রভৃতি), (৬) বিষম পরিহারজা অর্থাৎ বিপরীত ভাবে অনুষ্ঠিত দ্রব্যাদি ব্যবহার (৭) আকস্মিক আক্রমণ ও (৮) কর্ম বিপাক অর্থাৎ উৎপীড়ক ও উপঘাত কর্ম প্রভাবে উৎপন্ন ব্যাধি।

ভূণতত্ত্ব

এখন আমরা সম্ভবে দেহ প্রাপ্তি বা রূপের গঠন সম্বন্ধে আলোকপাত করবো। সংযুক্ত নিকায়ের যক্ষসংযুক্তে উল্লেখ আছে যে, এক সময়ে ভগবান রাজগৃহে ইন্দ্রকূট পর্বতে অবস্থান করতে ছিলেন। তখন যক্ষ ইন্দ্রক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে গাখার বলেছিলেন।

“বুদ্ধগণ রূপ ও ভৌতিক দেহকে জীব বলে বলেন না। এই সম্বন্ধে কিভাবে এই শরীর লাভ করে? কোথা হতে তার অস্থি, যকৃৎ, পিত্ত, ইত্যাদি আসে? এই সম্বন্ধে কিভাবে মাতৃ গর্ভে লগ্ন হয়?” বুদ্ধ বলেন-“প্রথমে কলল বলে কথিত পদার্থ হয়। কলল থেকে অর্বুদ বলে কথিত পদার্থ হয়। এই অর্বুদ হতে পেশী জন্মে। পেশী থেকে ঘণ বলে মাংস পিণ্ড উৎপন্ন হয়। ঘণ হতে প্রশাখা বা হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং কেশ নখ লোম উৎপন্ন হয়। সত্ত্বের মাতা অনুপান ভোজন যাহা কিছু গ্রহণ করে, মাতৃগর্ভস্থ সম্বন্ধে তাতে তথায় জীবন যাপন করে।” এখানে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে সত্ত্বের মাতৃগর্ভে প্রবেশের জন্য তিন বিষয়ের প্রয়োজন। যথা- (১) মাতাকে ঋতুমতী হতে হবে, (২) পিতামাতার সংযোগ হতে হবে ও (৩) গান্ধবের উপস্থিতি থাকতে হবে। তাতেই কললের সৃষ্টি হবে।

উপরিউক্ত বিষয় সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থ ছাড়া বৌদ্ধ সাহিত্যের নির্দেশ, বিশুদ্ধমার্গ এবং সংযুক্ত। নিকায়ের অষ্টকথায় ভূণতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এখানে সংযুক্ত-নিকায়ের অর্থ কথায় বর্ণিত ভূণতত্ত্বের প্রত্যেক স্তরের সময় আলোকপাত করা হচ্ছে। পিতার শুক্র ও মাতা ডিম্বকোষের সংযোগের ফলে গান্ধব উপস্থিত হলে অনাবিল তিল, তৈলের আকারে ‘কলল’-এর সৃষ্টি হয়। এই কলল মাতৃগর্ভে এক সপ্তাহ অবস্থান করে। দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিপক্ব হয়ে মৎস্য দ্বীপ জলের আকারে অর্বুদে পরিণত হয়। এখানে কায়বিজ্ঞান নামক পুস্তক হতে একগাখার উদ্ধৃতি দিচ্ছি-

কায়বিজ্ঞান-দুঃখ নির্দেশ।

৮। লাভিত্বা হেতু সামগ্গিক মন্সুদা দিমত্ত মাযতি,

অবিজ্ঞানাদে হেতুমিহ তথ তথৈব নসসতি।”

বহাধুত্বাৎ : কর্মক্লেশাদি হেতুর উপকারিতায় অর্বুদ আকারে পরিণত হয় বটে, কিন্তু সেই সময়ে হেতু বিদ্যমান না থাকলে কলল অর্বুদাদি অবস্থাতেই বিনষ্ট হয়ে থাকে।

অর্বুদ অবস্থান এক সপ্তাহ অতিক্রম করে উহা তরল সীসার ন্যায় ঈষৎ ঘনীভূত হয়ে পেশীতে পরিণত হয়। পেশী দেখতে এক টুকরা কাপড়ে আবদ্ধ মরিচের খোলার ন্যায় ঈষৎ রক্তবর্ণ। পেশী চতুর্থ সপ্তাহে গাঢ় রক্তবর্ণ কুঁকটের ডিম্বের আকারে ধারণ করে সে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, উহাকে ঘণ বলে।

কোন কোন গ্রন্থে ঘণ হতে 'পসাখ' অবস্থার উল্লেখ আছে। সংযুক্ত নিকায় অর্থকথায় ও কায়বিজ্ঞান গ্রন্থে ঘণ হতে হস্তপদ চতুষ্টয় ও মস্তক এই পঞ্চ অঙ্গ উৎপত্তির জন্য বর্ধিতাকারে মাংস বের হয়ে পাঁচ পীড়ক (পিলকা) উৎপন্ন হয় বলে উল্লেখ আছে। সংযুক্ত নিকায় অর্থ কথায় আরও উল্লেখ আছে যে সত্ত্ব মাতৃগর্ভে ১৫৪দিন অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রাপ্ত হয়। মাতৃগর্ভে সত্ত্বের নাভি হতে উৎপল ডাঁটার ন্যায় ছিদ্রযুক্ত নাড়ী মাতার উদর (জরায়ু) পটলের সাথে একবদ্ধ হয়ে থাকে। তার মাতা যে অনুপানাদি পানভোজন করে, সে উক্ত ভুক্ত দ্রব্যের রস মাতার উদর সম্বন্ধ যুক্ত নাড়ী দিয়ে আহরণ করে কুক্ষিগত সত্ত্ব বহুকাল জীবিত থাকে। সেই গর্ভস্থ সন্তান কর্মজ বায়ু দ্বারা স্থিত স্থান হতে পরিবর্তিত হয়ে প্রপাতরূপ যোনিমার্গে উর্দ্ধপাদ ও অধোশির হয়ে পতিত হয়ে থাকে। কর্মজ বায়ুর দ্বারা গর্ভজ সন্তান যোনিমার্গে উপরিউক্ত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে।

মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে প্রসাদ ইন্দ্রিয় ও ভাবেন্দ্রিয় পরিপূর্ণ হয়ে স্ত্রী পুরুষ লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। কারণ ভাব, লিঙ্গ, নিমিস্ত, কৃত্য ও আচরণ প্রভৃতি দ্বারা স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য নির্ধারিত হয়। তখন শরীরের দীর্ঘকালের জীর্ণ অসার বৃক্ষে বহু ছিদ্র হওয়ার ন্যায় সতত দৈহিক অণুচি প্রবাহিত হবার জন্য নয় দরজা উৎপন্ন হয়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে কর্মস্থান নির্দেশে সত্ত্বের মৃত্যুর পর মৃত দেহের দশ প্রকার অণুভ পরিবর্তনের কথা উল্লেখ আছেঃ (১) উদ্ধুমাতকং-ফুলে যাওয়া, (২) বিনীলকং-মাংস বহুলস্থানে শ্বেতবর্ণ এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে নীলবর্ণ, (৩) বিপুববকং-নয়দ্বার দিয়ে পূজ ও রস বের হয়ে দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া, (৪) বিচ্ছিদকং- মৃতদেহ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাওয়া, (৫) বিক্খাযিতকং-মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত হওয়া, (৬) বিক্খিস্তকং- নানা দিকে দেহের মাংস বিক্ষিপ্ত হওয়া, (৭) হতবিক্খিস্তকং- ছিন্নি-বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ। (৮) লোহিতকং-রক্ত দ্বারা স্রাবিত মৃতদেহ (৯) পুলবকং-পোকা দ্বারা পরিক্ষিপ্ত মৃতদেহ (১০) অটঠিকং-কংকার সার মৃতদেহ। এখন আমরা আমাদের মূল বিষয় বৌদ্ধ সাহিত্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা 'আলোচনার সূত্রপাত করবো। আমরা এখানে সর্বপ্রথম সংযুক্ত নিকায় (পঞ্চাংগ) হতে 'গিরিমানন্দ সুস্ত' উল্লেখ করতেছি।-

গিরিমানন্দ সূত্র

১। এবং মে সূতং-একং সময়ং ভগবা সাবখিয়ং

বিহরতি জেতবনে অনাখপিন্ডিসস আরামে।

তেন খো পন সময়েন আয়স্মা

গিরিমানন্দো আবাব্বিকো হোতি দুক্খিতো

বাল্লহ গিলানো; অথ খো আয়স্মা আনন্দো,

যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং

অভিবা দেত্ত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তা

নিসিন্নো খো আয়স্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ-

২ । আয়স্মা ভন্তে গিরিমানন্দো আবাহিকো
 দুকষিতো বাল্‌হগিলানো, সাধুভন্তো ভগবা
 যেনায়স্মা গিরিমানন্দো তেনুসঙ্কনতু
 অনুকম্পং উপাদায়াতি । সচে খো ত্বং আনন্দ!
 গিরিমানন্দস্ ভিক্‌খনো উপসঙ্কামিত্বা দস সঃঞা
 ভাসেয্যাসি, ঠানং খো পনেতং বিজ্জতি যং
 গিরিমানন্দসস ভিক্‌খনো দসসঃঞা সুত্বা
 সো আবোধো ঠানসো পটিম্বস্ স্তেয্য ।

৩ । কতমে দস? অনিচ্চসঃঞা, অনন্ত সঃঞা,
 অসুভসঃঞা, আদীনবসঃঞা, পহাণসঃঞা,
 বিরাগ সঃঞা নিরোধ সঃঞা, সক্ষলোকে
 অনভিরতি সঃঞা, সবসজ্জ্বারেসু অনিচ্চসঃঞা
 আনাপাণ সতীতি ।

৪ । কতমাচানন্দ! অনিচ্চসঃঞা? ইধানন্দ
 ভিক্‌খু অরঃঞগতো বা রুক্‌খমূলগতো বা
 সুঃঞাগারগতো বা ইতি পটিসংচিক্‌খতি;
 রূপং অনিচ্চং, বেদনা অনিচ্চা, সঃঞা অনিচ্চা,
 সংখারা অনিচ্চা, বিঃঞানং অনিচ্চন্তি । ইতি
 ইমেসু পঞ্চসুপাদন কথঙ্কেসু অনিচ্চানুপস্‌সী
 বিহরতি, অয়ং বুদ্ধতানন্দ! অনিচ্চসঃঞা ।

৫ । কতমাচানন্দ! অনন্তসঃঞা? ইধানন্দ!
 ভিক্‌খু অরঃঞগতো বা রুক্‌খমূলগতো বা
 সুঃঞাগারগতো বা, ইতি পটিসংচিক্‌খতি—চক্‌খুং
 অনন্তা, রূপং অনন্তা, সোতং অনন্তা, সদ্ধা অনন্তা,
 ঘাণং অনন্তা, গন্ধা অনন্তা, জিহ্বা অনন্তা, রসা
 অনন্তা, কায়ো অনন্তা,
 ফোট্ঠস্সা অনন্তা, মনো অনন্তা, ধম্মা অনন্তাতি ।
 ইতি ইমেসু ছসু অজ্জাতিক বাহিরেখু আয়তনেসু
 অনন্তানুপস্‌সী বিহরতি, অয়ং বুদ্ধতানন্দ! অনন্ত সঃঞা ।

৬ । কতমাচানন্দ! অসুভসঃঞা? ইধানন্দ
 ভিক্‌খু ইমমেব কায়ং উদ্ধং পাদতলা, অধো
 কেসমথকো, তচপরিয়ত্তং পুরং নানপ্পকারসস্
 অসুচিনো পচ্চবেক্‌খতি । অপি ইমস্মিং কায়ে—
 কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো; মংসং, নহারু,
 অট্ঠি, অট্ঠিমিঞ্জা, বক্কং, হদয়ং, যকনং,

কিলোমকং, পিহকং পপ্ফাসং, অন্তং, অন্তঃপং

উদরিয়ং করীসং পিত্তং, সেমহং, পুবেবা,

লোহিতং, সেদো, মেদো, অসসু, বসা, খেলো

সিঙঘানিকা, লসিকা, মুত্ত্তি । ইতি ইমস্মিং কায়ে

অসুভা নুপস্সী বিহরতি, অয়ং বুদ্ধতানন্দ !

অসুভ সঞ্ঞা ।

৭ । কতমাচানন্দ ! আদীনব সঞ্ঞা ? ইধানন্দ

ভিকখু অরঞ্ঞগতো বা রুকখমূলগতো বা সুঞ্ঞাগারগতো

বা; ইতি পটিসংচিক্খতি

বহুদুকখো খো অয়ং কায়ো, বহু আদীনবো

ইতি ইমস্মিং কায়ে বিবিধা আবাধা উপ্পজ্জন্তি ।

সেয়াধীদং—চক্কুরোগো, সোতরোগো,

ঘাণরোগো, জিহ্বা রোগো, কায়রোগো, সীস রোগো,

কন্ন রোগো, মুখরোগো, দন্তরোগো, কাসো,

সাসো, পিণাসো, ডহো, জরো, কুচ্ছিরোগো,

মুচ্ছা, পক্কন্দিকা, সূলা, বিসূচিকা, কুট্ঠং,

গভো, কিলাসো, সোসো, অপমারো, দদ্ধু,

কভু, কচ্ছু, রখসা, বিতচ্ছিকা, লোহিত পিত্তং,

মধুমহো, অংসা, পিল্লহকা, ভগন্দল্লাহা, পিত্ত—

সমুট্ঠনা আবাধা, সেমহসমুট্ঠানা আবাধা,

বাতসমুট্ঠানা আবাধা, সন্নিপাতিকা আবাধা,

উত্থপরিণামজ্জা আবাধা, বিষমপরিহারজা আবাধা,

ওপক্কমিকা আবাধা, কস্মবিপাকজা আবাধা,

সীতং, উগ্গং, জিঘচ্ছা, পিপাসা, উচ্চারো,

পসসাবোতি । ইতি ইস্মিং কায়ে আদীনবানু পস্সী

বিহরতি । অয়ং বুদ্ধতানন্দ । আদীনবসঞ্ঞা ।

৮ । কতমাচানন্দ ! পহাণসঞ্ঞা ? ইধানন্দ

ভিকখু উপ্পনং কামবিতক্কং নাধিবাসেতি পজ্জহতি;

বিনোদেতি ব্যত্তিকরোতি অনভাবং গমেতি;

উপ্পন্নং ব্যাপাদঠিতক্কং নাধিবাসেতি পজ্জহতি;

বিনোদেতি ব্যত্তি করোতি অনভাবং গমেতি । উপ্পন্নং

বিহিংসা বিতক্কং নাধিবাসেতি পজ্জহতি, বিনোদেতি

ব্যত্তি করোতি অনভাবং গমেতি, উপ্পন্নপল্লো পাপকে

অকুসলে ধম্মে নাধিবাসেতি পজ্জহতি; বিনোদেতি

ব্যত্তিকরোতি অনভাবং গমেতি; অয়ং

বুদ্ধতানন্দ ! পহাণসঞ্ঞা ।

৯। কতমাচানন্দ! বিরাগ সঞ্ঞা? ইধানন্দ ভিক্ষু
 অরঞ্ঞগতো বা রুকখমূলগতো বা সুঞ্ঞাগার গতো
 বা, ইতি পটিসংচিকখতি। এতং সম্ভং এতং পণীতং
 যদিদং সস্স সংখার সমথো। সববু পধিপটি
 নিস্সগগো তণ্হকখয়ো বিরাগো নিস্সানত্তি,
 অয়ং বুদ্ধতানন্দ! বিরাগসঞ্ঞা।

১০। কতমাচানন্দ! নিরোধ সঞ্ঞা? ইধানন্দ!
 ভিক্ষু অরঞ্ঞ গতো বা রুকখমূলগতো
 বা সুঞ্ঞাগারগতো বা ইতি পটিসং চিকখতি—
 এতং সম্ভং এতং পণীতং যদিদং সস্সসঙ্খায়
 সমথো; সববু পধিপটি নিস্সগগো তনহকখয়ো
 নিরোধনিস্সানত্তি। অয়ং বুদ্ধতানন্দ! নিরোধ সঞ্ঞা।

১১। কতমাচানন্দ! সববলোকে অনভিরতি সঞ্ঞা?
 ইধানন্দ! ভিক্ষুয়ে লোকে উপায়ুপাদানা
 চেতসো, অধিট্ঠানাবিনিবে সানুসয়া, তে পজহন্তো
 বিরমতি ন উপাদিয়ন্তো। অয়ং বুদ্ধতানন্দ!
 সস্সলোকে অনভিরতিসঞ্ঞা।

১২। কতমাচানন্দ! সস্স সঙ্খারেসু অনিচ্ছসঞ্ঞা?
 ইধানন্দ! ভিক্ষু সস্স সঙ্খারোহি অট্টিয়তি
 হারয়তি জিণ্ণহতি। অয়ং বুদ্ধতানন্দ। সস্স
 সঙ্খারেসু অনিচ্ছ সঞ্ঞা।

১৩। কতমাচানন্দ! আনাপাপসতি? ইধানন্দ!
 ভিক্ষু অরঞ্ঞগতো বা রুকখমূলগতো বা সুঞ্ঞাগার
 গতো বা নিসীদতি পল্লঙ্কং আভুজিত্বা; উজ্জং
 ণায়ং পণিধায় পরিমুখং সতিং উপট্ঠ পেত্বা—
 সা সতোব অস্সসতি সতোপস্সতি। দীঘং
 সা অস্সসন্তো দীঘং অস্সসামীতি পজানতি,
 দীঘং বা পস্সসন্তো দীঘং পস্সসামীতি
 পজানতি। রস্সং বা অস্সসন্তো রস্সং অস্স
 সামীতি পজানতি। রস্সং পস্সসন্তো রস্সং
 পস্সসামীতি পজানতি। সস্সকায় পটিসংবেদী
 সস্সসিসামীতি সিকখতি, সস্সকায় পটিসংবদী,
 সস্সসি সামীতি সিকখতি; পস্সসন্তয়ং
 ণায়সঙ্খারং অস্সসিস্সাসীতি সিকখতি
 পস্সসন্তয়ং

কায়সজ্জারং পস্‌সসি সামী'তি সিক্‌খতি ।
 পীতি পটিসংবেদী অপস্‌সসিসামী'তি সিক্‌খতি ।
 পীতি পটিসংবেদী পসসি সসামী'তি সিক্‌খতি । সুখ
 পটিসংবেদী অস্‌সসিসামী'তি সিক্‌খতি;
 সুখপটি সংবেদী পসসি সসামী'তি সিক্‌খতি,
 চিত্ত সজ্জার পটিসংবেদী অস্‌সসিসামী'তি
 সিক্‌খতি, চিত্তসজ্জার পটিসংবেদী পস্‌স সিসামী'তি
 সিক্‌খতি । পসসন্তয়ং চিত্তসজ্জারং অস্‌সসিসামী'তি
 সিক্‌খতি, পসসন্তয়ং চিত্তসজ্জারং পস্‌সসি সসামী'তি
 সিক্‌খতি । চিত্তপটি সংবেদী অস্‌সসি সসামী'তি
 সিক্‌খতি, চিত্ত পটি সংবেদী পস্‌সসিসামী'তি
 সিক্‌খতি । অভিল্লমোদয়ং চিত্তং অস্‌সসি সসামী'তি
 সিক্‌খতি অভিল্লমোদয়ং চিত্তং পসসসিসামী'তি
 সিক্‌খতি । সমাদহং চিত্তং অস্‌সসি সামী'তি
 সিক্‌খতি, সমাদহং চিত্তং পস্‌সাসী
 সামী'তি সিক্‌খতি ।

বিমোচয়ং চিত্তং অস্‌সসিসামী'তি সিক্‌খতি
 বিমোচয়ং চিত্তং পস্‌সামিসামী'তি
 সিক্‌খতি । অনিচ্চানুপস্‌সী অস্‌সাসামী'তি
 সিক্‌খতি, অনিচ্চা নুপস্‌সী পস্‌সসিসামী'তি ।
 সিক্‌খতি । বিরাগানুপস্‌সী অস্‌সসি সসামী'তি
 সিক্‌খতি, বিরাগা নুপস্‌সী পস্‌সসি সসামী'তি
 সিক্‌খতি । নিরোধানুপস্‌সী অস্‌সসি সসামী'তি
 সিক্‌খতি, নিরোধনুপস্‌সী পস্‌সসি সসামী'তি
 সিক্‌খতি । পটিনিসস গগানুপস্‌সী অস্‌সাসি
 সসামী'তি সিক্‌খতি, পটিনিসসগগা নুপস্‌সী
 পস্‌সসিসামী'তি সিক্‌খতি । অয়ং বুদ্ধতানন্দ!
 আনাপান সতি ।

১৪ । সচে খো ত্বং আনন্দ! গিরিমানন্দস্‌স
 ভিক্‌খুনো উপসঙ্কামিত্বা ইমা দস সঞ্ঞা
 ভাসেয্যাসি, ঠানং যো পনেতং বিজ্জতি.
 যং গিরিমানন্দ স্‌স ভিক্‌খুনো ইমা দসসঞ্ঞা
 সুত্বা সে আবোধো ঠানসো পটিল্লসসন্তেয়াতি ।
 ১৫ । অথ খো আয়ুস্মা আনন্দো, ভগবতো
 সন্তিকে ইমা দসসঞ্ঞা উগ্গহেত্বা যেনায়স্মা

গিরিমানন্দো তেনু পসঙ্কামি, উপসঙ্কামিত্বা
 আয়স্মতো গিরিমানন্দস্ ইমাদসসঞ্ঞা
 অভাসি, অথ খো আয়স্মতো গিরিমানন্দস্
 ইমা দসসঞ্ঞা সুত্বা সো আবাব্বো ঠানসো
 পাটিম্বসসন্তি । বুট্ঠাহি চায়স্মা গিরিমানন্দো
 তমহা আবাব্বা, তথা পহীনো চ পনায়স্মতো
 গিরিমানন্দস্ সো আবাব্বা অহোসি ।

বহানুবাদঃ: (১) আমি একরূপ শুনেছি-এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনার্থপিণ্ডিদের আরামে জেতবনে অবস্থান করতেন। সে সময় আয়ুত্থান গিরিমানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন; তিনি ভীষণ পীড়াদায়ক ক্ষত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন আয়ুত্থান আনন্দ সেখানে ভগবান ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভগবানের নিকট উপনীত হয়ে তিনি ভগবানকে অভিনন্দন করে এক পার্শ্বে উপবেশন করলেন। এক পার্শ্বে উপবেশন করে তিনি ভগবানকে বল্লেন-

(২) “ভান্তে, আয়ুত্থান গিরিমানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি ভীষণ পীড়াদায়ক ক্ষতরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ভান্তে, ভগবান অনুকম্পাবশতঃ আয়ুত্থান গিরিমানন্দকে দর্শন করলে ভাল হয়।” ভগবান বল্লেন-“আনন্দ, যদি তুমি আয়ুত্থান গিরিমানন্দের নিকট যাও এবং তাকে দশসংজ্ঞা পাঠ করে শুনাও, এই দশসংজ্ঞা গিরিমানন্দ শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার রোগ উপশম হবার হেতু আছে।”

(৩) দশ সংজ্ঞা কি কি? যথা-অনিত্য সংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অন্তঃসংজ্ঞা, আদীনব সংজ্ঞা, পরিহার বা বর্জন সংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধ সংজ্ঞা, সর্বলোক অনভিরতি সংজ্ঞা, সর্ব সংস্কারে অনিত্যসংজ্ঞা এবং আনাপানস্মৃতি সংজ্ঞা।

(৪) আনন্দ, অনিত্য সংজ্ঞা কি? আনন্দ, এখানে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষ-মূলে অথবা শূন্যাগারে গিয়ে এইরূপ ধ্যানে মগ্ন হয়-‘রূপঅনিত্য, বেদনা অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কার অনিত্য ও বিজ্ঞান অনিত্য।’ এইভাবে পঞ্চোপাদানরূপ অনিত্য ধ্যানে রত থাকেন। আনন্দ, ইহাকে অনিত্য সংজ্ঞা বলা হয়।

(৫) আনন্দ, অনাত্ম সংজ্ঞা কি? আনন্দ, এখানে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যাগারে গিয়ে এইরূপে ধ্যানে মগ্ন থাকেন। চক্ষু অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, শ্রোত্ অনাত্মা, শব্দ অনাত্মা, স্পর্শ অনাত্মা, গন্ধ অনাত্মা, জিহ্বা অনাত্মা, রস অনাত্মা, কায় অনাত্মা, স্পর্শব্য অনাত্মা, মন অনাত্মা, ধর্ম অনাত্মা”। এইভাবে তিনি ছয় বাহ্যিক ও ছয় আভ্যন্তরীণ আয়তন অনাত্মা ধ্যানে রত থাকেন। আনন্দ, উহাকে অনাত্ম সংজ্ঞা বলা হয়।

(৬) আনন্দ, অন্তঃসংজ্ঞা কি? আনন্দ এখানে ভিক্ষু এই দেহে পায়ের তলা হতে ঈর্ষ্যে মাথার কেশ পর্যন্ত নিয়ে চর্মদ্বারা আবৃত দেহে নানা প্রকার অণুচি দ্রব্য পর্যবেক্ষণ করেন। এই দেহে আছে-কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, পেশীতন্তু, অস্থি, স্তিমজ্জা, বহু, হৃদয়, যকৃৎ, ক্রোম, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর্য, করীষ, পিত্ত,

শ্লেষ্মা, পুঁচ, রক্ত, শ্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, থু থু, সিঁথুনী, লসিকা, মূত্র ।' এইরূপে তিনি কায়ে অন্তঃস্থানে মগ্ন থাকেন । আনন্দ, ইহাকে অন্তঃস্থ সংজ্ঞা বলা হয় ।

(৭) আনন্দ, আদীনব সংজ্ঞা কি? আনন্দ, ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যাগারে গিয়ে এইভাবে ধ্যানে মগ্ন থাকেন-এই দেহে অনেক দুঃখ আছে, অনেক আদীনব বা উপদ্রব আছে । এই দেহে বিবিধ প্রকার রোগের উৎপত্তি হতে পারে । যথা-চক্ষুরোগ, শ্রোত্ররোগ, ঘ্রাণরোগ, জিহ্বা রোগ, কায় রোগ, শির রোগ, কর্ণ রোগ, মুখ রোগ, দন্তরোগ, কাশ, শ্বাস বা হাঁপানী, পিনাস বা সর্দি, দাহ, জ্বরা, পেটের রোগ, মুচ্ছা, আমাশয়, সূল, কলেরা, কুষ্ঠ, ফোঁড়া বা গন্ড, কিলাস বা একজিমা, যক্ষ্মা, অপমারো বা মৃগীরোগ, দাদ, কন্ডু বা চুলকানি, কঙ্কু বাখোস পাঁচড়া, রখসা বা চর্মরোগ, বিতল্লিকা বা খোস, পান্দুরোগ, বহুমূত্র, অর্শ্ব, বিষফোঁড়া, ভগন্দর, পিত্তরোগ, শ্লেষ্মাজনিত রোগ, বাতব্যাদি, বায়ু জাত রোগ, শারীরিক রস জাতরোগ, সন্নিপাতিক রোগ, ঋতু পরিবর্তনের রোগ, শরীরের অতিরিক্ত চাপের ফলে উৎপন্ন রোগ, কর্ম বিপাক রোগ, শীত-উষ্ণ-ক্ষুধা-পিপাসা-মল-মূত্র জনিত রোগ । এইভাবে তিনি এই দেহে আদীনব ধ্যানে মগ্ন থাকেন । আনন্দ, উহাকে আদীনব সংজ্ঞা বলা হয় ।

(৮) আনন্দ, পরিহার বা বর্জন সংজ্ঞা কি? আনন্দ, এখানে ভিক্ষু উৎপন্ন কামবিতর্ক গ্রহণ না করে, বরং উহাকে বর্জন করেন, সংযত করেন, উহার অন্ত সাধন করেন এবং যাহাতে পুনরুৎপন্ন হতে না পারে তাতে সচেষ্ট হন । উৎপন্ন ব্যাপাদ বিতর্ক--উৎপন্ন বিহিংসাবিতর্ক-সময়ে উৎপন্ন পাপ---সচেষ্ট হন । আনন্দ, ইহাকে পরিহার সংজ্ঞা বলা হয় ।

(৯) আনন্দ, বিরাগসংজ্ঞা কি? আনন্দ, ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যাগারে গিয়ে এইরূপ ধ্যানে মগ্ন থাকেন-ইহা যথার্থ, ইহা প্রণীত যদ্বারা সকল সংস্কার সমাহিত হয় । সকল উপধি পরিবর্জিত হয়, তৃষ্ণাক্ষয় হয়, বিরাগ হয়, নির্বান পথ সুগম হয় । আনন্দ ইহাকে বিরাগ সংজ্ঞা বলা হয় ।

১০ । আনন্দ, নিরোধ সংজ্ঞা কি? আনন্দ, এখানে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যাগারে গিয়ে এইভাবে ধ্যানমগ্ন হয়--ইহাই যথার্থ, ইহাই প্রণীত যদ্বারা সকল সংস্কার সমাহিত, সকল উপধি পরিবর্জিত হয়, তৃষ্ণাক্ষয় হয়, বিরাগ হয় এবং নির্বান পথ সুগম হয়, আনন্দ ইহাকে নিরোধ সংজ্ঞা বলা হয় ।

১১ । আনন্দ, সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা কি?

আনন্দ, এখানে ভিক্ষু জগতে চেতনার সকল উপাদান এবং অনুশয় অধিষ্ঠান অভিনিবেশ করেন না, বরং পরিবর্জন করে উহাতের প্রতি আসক্ত হন না । আনন্দ ইহাকে সর্ব লোকে অনভিরতি সংজ্ঞা বলে ।

১২। আনন্দ, সকল সংস্কারে অনিত্যসংজ্ঞা কি? আনন্দ, এখানে ভিক্ষু সকল সংস্কারে প্রতি বিরক্তি হন, লজ্জিত হন এবং ঘৃণাবোধ করেন। আনন্দ, ইহাকে সকল সংস্কারে অনিত্য সংজ্ঞা বলা হয়।

১৩। আনন্দ, আনাপনস্মৃতি সংজ্ঞা কি? আনন্দ, এখানে ভিক্ষু অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, শূন্যাগারে গিয়ে পযঙ্ক আভূজন করে উপবেশন করেন। তার দেহ ঋজুভাবে স্থাপন করে কর্মস্থান বা স্মৃতি অভিमुखে মনোযোগ দিয়ে থাকেন। তিনি স্মৃতিমান হয়ে আশ্বাস গ্রহণ করেন এবং স্মৃতিমান হয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘ আশ্বাস গ্রহণ করলে দীর্ঘ আশ্বাস গ্রহণ করতেছেন বলে জানেন এবং দীর্ঘ আশ্বাস গ্রহণ করেন। দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করলে দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করতেছেন বলে জানেন এবং দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করেন। দ্রুত আশ্বাস গ্রহণ করলে দ্রুত আশ্বাস গ্রহণ করতেছেন বলে জানেন এবং দ্রুত প্রশ্বাস ত্যাগ করেন। দ্রুত প্রশ্বাস ত্যাগ করলে দ্রুতপ্রশ্বাস ত্যাগ করতেছেন বলে জানেন এবং দ্রুত প্রশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি হৃদ বশে মনে করেন আমি আমার সব কায়মনে আশ্বাস, অনুভব করে আশ্বাস গ্রহণ করব এবং আমার সর্বকায় মধ্যে প্রশ্বাস অনুভব করে প্রশ্বাস ত্যাগ করব। কায়সংস্কারকে সমাহিত করে আশ্বাস গ্রহণ করেন এবং কায়সংস্কারকে সমাহিত করে প্রশ্বাস ত্যাগ করবেন।

তিনি হৃদ বশে মনে করেন-প্রীতি বশে আমি আশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করব। সুখবশে আমি আশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ এবং ত্যাগ করব। চিন্তের সংস্কার বশে আমি আশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করব। চিন্ত সমাহিত বশে আমি আশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করব।

তিনি হৃদ বশে মনে করেন আমার চিন্ত অভিপ্রমোত্ত করে আমি আশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করব। চিন্ত প্রশান্ত করে আমি আশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করব।

তিনি হৃদ বশে মনে করেন-চিন্তকে অনিত্য ভাবনায়--বিরাগ বশে--নিরোধ বশে--পরিহার বশে--গ্রহণ ও ত্যাগ করেন।

আনন্দ, ইতাকে আনাপনস্মৃতি সংজ্ঞা বলে।

১৪। আনন্দ, এখন তুমি যদি আয়ুস্মান গিরিমানন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে এইদশ সংজ্ঞা তাকে আবৃত্তি করে শুনতে পার, এই দশ সংজ্ঞা শুন্য সঙ্গী গিরিমানন্দের রোগ উপশম হবার হেতু আছে।

১৫। অতপর আনন্দ ভগবানের নিকট এই দশ সংজ্ঞা শিক্ষা করে আয়ুস্মান গিরিমানন্দের নিকট উপনীত হলেন। উপনীত হয়ে আয়ুস্মান গিরিমানন্দকে দশ সংজ্ঞা ব্যক্ত করেন। তখন আয়ুস্মান গিরিমানন্দ এই দশ সংজ্ঞা শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করেন। তিনি সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন। এইভাবে আয়ুস্মান গিরিমানন্দের রোগ তিরোহিত হয়েছিল।

উপরিউক্ত সুস্থ আমরা বৌদ্ধ সাহিত্যে আলোচিত আমাদের শরীর ও শরীরের রোগসমূহ সহ আধ্যাত্মিক রোগ উপশমের একটা প্রামাণ্য ভিত্তি হিসাবে ধারণা করতে পারি। এখন আমরা বিনয় পিটকের মহাবর্গ, চুল্লবর্গ, অঙ্গুস্তর নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, নিদ্দেশ, মিলিন্দ প্রশ্ন প্রভৃতি 'গ্রন্থ' হতে রোগের নিদান সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করবো। রোগের কারণ সমূহ আমরা নিম্ন লিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারি।

১। পিত্ত

২। শ্লেষ্মা

৩। বায়ু

৪। শারীরিক তরল পদার্থের সংমিশ্রণ বা সন্নি বাতিকরোগ

৫। ঋতু পরিবর্তন

৬। শরীরে অতিরিক্ত চাপের ফল

৭। শরীরের কোন অঙ্গের সংকোচন

৮। কর্মের বিপাক।

ধাতুবশে আমরা যদি রোগের কারণ চিহ্নিত করতে যাই, আমরা মানবদেহে ৪২ প্রকার অণুচি দ্রব্য চিহ্নিত করতে পারি। যথা-পৃথিবী-২০, আপ-১২, তেজ-৪ এবং বায়ু-৬=সর্বমোট ৪২। শরীরে ৩২ প্রকার অণুচি দ্রব্যের মধ্যে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, পেশীতন্তু, হাড়, হাড়ের মজ্জা, বন্ধ, হৃদয়, যকৃৎ, ক্রোম, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, করীষ, মস্তিষ্ক প্রভৃতি ২০ পৃথিবী ধাতু। পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু বসা, থুথু, সিখনি, লসিকা, মুত্র প্রভৃতি ১২ অণুচি দ্রব্য আপধাতু। শরীরের তেজ ধাতু প্রভাব চার প্রকার পরিলক্ষিত হয়। যথা- ১। সন্তাপ, (২) জীর্ণ (৩) দাহ এবং (৪) পাচক। তেজ ধাতু কুপিতহলে শরীর সন্তপ্ত হয় এবং জ্বর রোগাদি উৎপন্ন হয়ে শরীর উষ্ণ হয়। এই অবস্থাকে সন্তাপ তেজ ধাতু বলা হয়। যাহার দ্বারা শরীর জরাজীর্ণ ইন্দ্রিয় বিকল বলক্ষয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়, তাকে জীর্ণ তেজ ধাতু বলা হয়। যাহা কুপিত হলে শরীরে জ্বালা পোড়া হয় এবং সে ধাতু ক্ষোভে পীড়িত ব্যক্তি, 'জ্বলছি,' 'জ্বলছি' বলে ক্রন্দন করতঃ ঘৃত, চন্দন, তাল ব্যজনীর বাতাস লাভের ইচ্ছে করে। উহাকে দাহ তেজ ধাতু বলা হয়। সে তেজ ধাতু দ্বারা ভোজ্য দ্রব্য পরিপক্ক হয়। তাকে পাচক তেজ ধাতু কহে।

বায়ু ধাতু ছয়টি। যথা (১) উদগার ও হিষ্কাতির উৎপাদক বায়ু উর্দ্ধগামী বায়ু ধাতু (২) মলমত্রাদির নিঃসরক বায়ু অধোগামী বায়ু ধাতু (৩) অঙ্গের বাহিরের বায়ু কুক্ষিশয় বায়ু ধাতু (৪) অঙ্গের ভিতরের প্রবর্তিত বায়ু কোষ্ঠাশয় বায়ু ধাতু (৫) ধমনী বা স্নায়ু জ্বালানুসারে সম্ভূত শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্কোচন প্রসারণাদি কার্য নির্বাহক

বায়ু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুসারী বায়ু ধাতু । (৬) ভিতরের প্রবেশ শীল নাসিকা বায়ু আশ্বাস আর বাহিরে নিক্রমনশীল বায়ু প্রশ্বাস ধাতু-আশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু ধাতু ।

বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন শারীরিক ব্যথা বাত ব্যাধি নামে অভিহিত করতে দেখা যায় । যেমন- (১) অঙ্গবাত (২) উদরবাত (৩) কর্মজবাত (৪) কুক্ষিবাত (৪) পীঠবাত প্রভৃতি ।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রকে আয়ুর্বেদ নামে অভিহিত করা হয়েছে । আয়ুর্বেদে বর্ণিত রোগের কারণ হিসাবে বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মাকে চিহ্নিত করা হয়েছে ।

এখন আমরা বৌদ্ধ সাহিত্যের উল্লিখিত চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে প্রয়াসী হবো । বৌদ্ধ সাহিত্যে আলোচিত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আমরা প্রধানত চারটা ভাগে করে নিতে পারি । যথা-

১ । সত্য ক্রিয়ার প্রভাব

২ । সংস্কার জাত প্রভাবে চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা ।

৩ । ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য লাভ বা ভৈষজ্য চিকিৎসা

৪ । শৈল্য ব্যবস্থা ।

আমরা বুদ্ধ বর্ণিত গিরিমানন্দ সুস্ত উল্লেখ করে প্রমাণ করেছি যে দশসংজ্ঞার প্রতি মনোনিবেশ করাতে আয়ুত্মান গিরিমানন্দ ভীষণ পীড়াদায়ক ক্ষত রোগ হতে আরোগ্য লাভ করেছিলেন । বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে সত্য ক্রিয়ার প্রভাবে শুধু মানুষ নহে বিভিন্ন সত্ত্বগণ জরা ব্যাধি ছাড়া বিভিন্ন বিপদ আপদ হতে মুক্ত হতে পারেন । জাতকে, মিলিন্দ প্রশ্নে এই সত্য ক্রিয়ার অনেক উদ্ধৃতি আছে । আঙ্গুলীমাল সূত্র আবৃত্তি করে আঙ্গুলি স্থবির সত্যক্রিয়া করাতে অসীম কষ্টভোগী এক প্রসূতি স্বাভাবিক প্রসব করতে দেখা যায় । জিনপঞ্জর গাথা আবৃত্তি করে বুদ্ধ এক মৃত্যু পথযাত্রী বালককে ১২০ বৎসর আয়ু বর্ধন করেছিলেন । এইরূপ অসংখ্য সত্য ক্রিয়ার কথা বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে ।

স্থান, কাল এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ মানুষের জীবনকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে । অতি প্রাচীন কাল হতে মানুষের মধ্যে এই প্রভাব কাজ করে আসতেছে । তাতে মানুষের সৃষ্টি হয় সংস্কারের । এই সংস্কার বিবিধ ভাবে আমাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে চিকিৎসা শাস্ত্রেও এই সংস্কারের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । অনেক দিন ধরে যে সকল দ্রব্যাদি গ্রহণ করে ও শরীরের রোগ ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ করা যায়, তাহা মানুষ অন্ধ বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করতে থাকে । এই সংস্কার চিকিৎসা ব্যবস্থায় বৌদ্ধ সাহিত্যেও দেখা যায় । এক সময়ে শারীপুত্র স্থবিরের ভীষণ অসুখ হয়েছিল । মোগগাল্লায়ন স্থবির শারীপুত্র স্থবিরের কষ্ট দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন কি গ্রহণ করলে তার অসুখ সেরে যায় । শারীপুত্র স্থবির তাঁর বাল্যকালে এই রূপ অসুখ হলে তাঁর

মাতা তাঁকে পদ্মফুলের মৃনাল খেতে দিতে বলে উল্লেখ করেন। মোগগান্ধায়ন স্ববির পদ্মের মৃনাল সংগ্রহ করে শারীপুত্র স্ববিরকে খেতে দিলে শারীপুত্রের অসুখ সেরে যায় বলে উল্লেখ আছে। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে যদিও মানুষেরা দ্রব্য গুণ সম্বন্ধে সম্যকরূপে জ্ঞাত নহে, তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তার সংস্কার সৃষ্টি হয়েছে। সেইরূপে দ্রব্যাদি সেবন করে রোগমুক্তি লাভ করতে দেখা যায়। তাই এই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আমরা সংস্কার জাত প্রভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করতে পারি। আমরা এখন ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য লাভ ও ভৈষজ্য চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোকপাত করবো। মহাবর্গ নামক বিনয় পিটকের গ্রন্থ হতে ভৈষজ্য ঋদ্ধ নামক পরিচ্ছেদ হতে প্রথমে আমাদের আলোচনা শুরু করবো। ভগবান বুদ্ধ এক সময়ে শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান কালে ভিক্ষুদের শারদীয় রোগী (**autumnal disease**) আক্রান্ত হতে দেখে তিনি ভিক্ষুদের পঞ্চবিধ ভৈষজ্যের বিধান করেন। এই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য হল-চর্বি, নবনীত, তৈল, মধু এবং শক্ত গুড়। তিনি চিন্তা করলেন এই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য জনসাধারণ ভৈষজ্য রূপে গন্য করে এবং মানুষের আহারের কার্যও সম্পন্ন করে অথচ স্থূল আহারের মধ্যে পরিগণিত হয় না। তাই তিনি এই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য ভিক্ষুদের সকালে ও বিকালে সেবন করার জন্য অনুজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ মধ্যে কে কে এই অজীর্ণ রোগে আরও কৃশ, রুক্ষ, দুর্বল পাপুর্বণ হয়ে শরীরের শিরা উপশিরা জালাকারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তাই এই ভৈষজ্য প্রয়োগের জন্য চর্বির প্রয়োজন হয়েছিল। এই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য ভল্লকের চর্বি, মৎস্যের চর্বি, শিশুমারের চর্বি (**alligators**), শূকরের চর্বি, গর্ভবের চর্বি প্রভৃতি চর্বির সহিত প্রয়োগ করতে হল। এইভাবে এই পঞ্চবিধ ভৈষজ্যের সহিত মূল বা গাছের শিকরে সংমিশ্রনের প্রয়োজন হওয়াতে উহা হলুদ, আদা, বচ (**Orri's roof**) বচস্থ (**White orris root**) অতিবিষ, কটুক রোহিনী, উশীর (বেনার মূল), ভদ্র মুস্তক (নাগর মোহা) প্রভৃতি মূলের সহিত প্রয়োগ হত। এই ভৈষজ্যের সহিত কষার সংমিশ্রনের প্রয়োজন হওয়াতে নিম্বের কষায়, গিরি মল্লিকার কষায়, পটোলের কষায়, পগগবের কষায়, নস্তামালের কষায় এবং খাদ্য ভোজ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেইরূপ কষার সহিত প্রয়োগ করা হত। পত্রের প্রয়োজন হওয়াতে নিম্বপত্র, গিরিমল্লিকাপত্র, পটোলাপত্র, তুলসীপত্র, কার্পাস পত্র প্রভৃতি, ফলের সহিত মিশ্রনের প্রয়োজন হওয়াতে বিড়ঙ্গ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, গোষ্ঠফল প্রভৃতি, জতু বা লাক্সা এর প্রয়োজন হতে হিঙ্গু, হিঙ্গু জতু, হিঙ্গু সিপাটিক, ওক, ওকপতি, তককর্নী, প্রভৃতি জতু এবং লবণ প্রয়োজন হওয়াতে সামুদ্রিক লবন, কাল লবন, সৈন্ধব লবন, বনস্পতি লবন, বিট লবন প্রভৃতি প্রয়োগ করতে হত।

এক সময় ভিক্ষুদের মধ্যে কন্ডু (চুলকানি) স্কেটক, আস্রাব অথবা খোসরোগ প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে গোময়, মৃত্তিকা অথবা রজন নিপক (পাক করা রঙের চূনা) ব্যবহার করতে দেখা যায়। অমনুষ্য জনিত রোগে কাঁচা মাংস ও টাটকা রক্তের প্রয়োগ উল্লেখ আছে।

চক্ষু রোগের জন্য নানা প্রকার অঞ্জন প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন কৃষ্ণাঞ্জন, রসাঞ্জন, স্রোতাঞ্জন, গেরিমাটি, কপল্ল (কঙ্কল, প্রদীপ শিখা হতে গৃহীত মসী) প্রভৃতি। আবার এই অঞ্জনের সহিত চন্দন, তগর, কালানুসারি, তালিস, ভদ্র মুস্তক প্রভৃতি সুগন্ধি ও পিষিবার দ্রব্য ব্যবহার করতে দেয়া যায়। অঞ্জন প্রস্তুত করবার জন্য অস্থি, দন্ত, শৃঙ্গ, নল, বংশ কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ, শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবহার দেখা যায়। অঞ্জন রাখবার জন্য বিভিন্ন ঢাকানিযুক্ত পাত্র এবং ব্যবহার জন্য শলাকা, শলাকা দানি প্রভৃতি ব্যবহার করা হত।

শির রোগের জন্য শির তৈল ব্যবহার, নস্য ব্যবহার এবং নস্য প্রয়োগ করার জন্য নস্যকরণী (নল) ব্যবহার করা হত। তাহাছাড়া শির রোগের জন্য ধূম ও ধূমনেত্র ব্যবহার করা হত।

বাত রোগের জন্য বৈদ্যতৈল পাক করে ব্যবহৃত হত। তৈলের সহিত মদ্য প্রক্ষেপ করেও পাক করা হত।

অঙ্গরোগের জন্য শ্বেদ নিঃসারণ (**Sweating**) করানোর ব্যবস্থা করা হত। শ্বেদ নিঃসারণের জন্য সম্ভার শ্বেদ (ধর্ম নিঃসারক নানাবিধ বৃক্ষপত্র পেতে তৎমধ্যে স্নান করানো) ব্যবহার দেখা যায়। শ্বেদ নিঃসরনের জন্য মহাশ্বেদ (মাটিতে শরীর স্থাপন করে বালি ও মাটির চাপা দিয়ে বিভিন্ন প্রকার তৈল ও বৃক্ষ পত্র দিয়ে শ্বেদ নিঃসরন) ভঙ্গোদক (দেহেজল ও পত্র দিয়ে শ্বেদ নিঃসরন) উদক-কোষ্ঠক (গরম জল রেখে রুদ্ধ কক্ষে শ্বেদ নিঃসরন) প্রভৃতি পদ্ধতি করা হত।

গাটরীবাতের জন্য শরীর হতে শিকার সাহায্যে রক্ত মোচন করা হত। পদতলে পাটলের জন্য তৈল মালিশ ও পায়ের ঔষধ ব্যবহার করা হত। গদু রোগের জন্য অস্ত্রোপচার করা হত। মলমের প্রলেপ হিসাবে কষার জল, তিলকঙ্ক (তিলের খইল) কবড়িকা (তুলার পটি) ব্রন আচ্ছাদনের পটি প্রভৃতি ব্যবহৃত হত।

ব্রন কণ্ডুয়ন হলে সর্ষপের খোসার দ্বারা সেক, ক্রেদাক্ত হলে ধূম প্রদান মাংস, বাড়তে থাকলে লবনের কাঁকর সেদন, ক্ষত গভীর হলে তৈল ও তৈলের জন্য ন্যাকড়ার পটি প্রয়োগ দেখা যায়।

সর্প দংশনের জন্য বাহ্য, প্রস্রাব, ভষ্ম ও মৃত্তিকা প্রয়োগ করা হত। বিষ পানের জন্য মল ভক্ষন করা দেখা যায়। ঘরদিন্নক রোগ (মজ্জকৃত পানীয় পানে রোগ) লাজলের ফালে লগ্নমাটি ও দুষ্টগ্রহ আক্রমণ করলে আমিষ ক্ষার (গুহুভাত দক্ষ করে, চূর্ণ করে ও জল মিশ্রিত করে পান করা) ব্যবহার দেখা যায়। পাদু রোগের জন্য গোমুত্র হরীতকী ভিজিয়ে পান করানো হত। চর্ম রোগের জন্য গন্ধকের প্রলেপ দেয়া, বদহজম হলে বিরেচক পান করানো হত। তাহাছাড়া বিভিন্ন রোগের জন্য ভাত পরিষ্রাবন করে জল অকট যুষ কটাকট যুষ এবং মাংসের যুষ ব্যবহার করা উল্লেখ আছে।

উদরে বায়ু রোগের জন্য বেনার মূল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বুদ্ধ ভিক্ষু দিগকে যবাগু ও মধু গোলক গ্রহণ করে যবাগুর দশ প্রকার ফলের কথা উল্লেখ করেন। যেমন-

১। যবাগু দাতা আয়ুদান করে থাকে।

২। বর্ণ (রূপ) দান করে থাকে।

৩। সুখ দান করে থাকে।

৪। বল দান করে থাকে।

৫। প্রতিভা দান করে থাকে।

৬। যবাগু দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ হয়।

৭। বায়ু অনুকুল করে।

৮। মুত্রনালী শোধন করে।

১০। অপক্ক পরিপাক করে।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে বুদ্ধের আমলে বিভিন্ন রোগের জন্য অস্ত্রোপাচার করা হত। আকাশ গোত্র নামক বৈদ্য জনৈক ভিক্ষু ভগবান রোগের অস্ত্রোপাচার দেখে বুদ্ধ ভিক্ষুদের গুপ্ত স্থানের চতুর্পার্শ্বে দুই আঙ্গুল পরিমিত স্থানের মধ্যে অস্ত্রোপাচার অথবা মুত্রস্থলী পীড়ন করাতে নিষেধ করেছেন। কারণ গুপ্ত স্থানের ত্বক কোমল হয়ে থাকে, ক্ষত সহজে আরোগ্য লাভ হয় না। অঙ্গ চালনা বড় কঠিন ব্যাপার। আমরা বৌদ্ধ সাহিত্যে রোগীর পরিচর্যা সম্বন্ধে আলোচিত বিষয় উল্লেখ করবো। এক সময় জনৈক ভিক্ষুর উদরাময় রোগ হয়েছিল। ভিক্ষু স্বীয় মলমূত্রে জড়িত হয়ে শায়িত ছিলেন। বুদ্ধ এই ভিক্ষু রোগের কথা জানতে পেরে স্বয়ং সেই রোগীকে জল সিঞ্চন করে তার পরিচর্যা করেছিলেন। তারপর তিনি উপাধ্যায়, আচার্য, সহবিহারী ও অন্তঃবাসী রোগীর রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পরিচর্যা করার অনুজ্ঞা করেন। তিনি সে সকল রোগী পরিচর্যা কষ্টকর ও সে সকল রোগীর পরিচর্যা সুখকর সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন, রোগী যোগ্য ও অযোগ্য পরিচায়ক ও চিহ্নিত করেন। আমরা যোগ্য পরিচায়কের কথা উল্লেখ করতেছি।

১। তিনি যথার্থ ভাবে ঔষধ প্রয়োগ করে জানেন।

২। তিনি অনুকুল প্রতিকুল চিনেন, প্রতিকুল অপসারিত করেন এবং অনুকুল উপস্থিত করবেন।

৩। মৈত্রী চিত্ত সেবা করেন, কোন লাভের আশায় নহে।

৪। মল, মুত্র, ধুতু এবং বমি পরিষ্কার করতে ঘৃণা বোধ করেন না।

৫। রোগীকে সময় সময় ধর্মোপদেশ দানে প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট করতে সমর্থ হবেন।

জীবকের জীবন বৃত্তান্ত

আমরা এখন বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত চিকিৎসকদের সম্বন্ধে আলোচনা করে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবহার পদ্ধতি স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে প্রয়াসী হয়। বিনয় পিটকের মহাবর্ণে উল্লিখিত জনৈক আকাশ গোত্র নামক বৈদ্যের কথা আমরা আগেই-উল্লেখ করেছি। মহাবর্ণে বইতে বুদ্ধের সমসাময়িক আমলের বিখ্যাত চিকিৎসক জীবকের নাম খুব গুরুত্বের সহিত উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে প্রাচীন চিকিৎসক বিষয়ক আচার্যদের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন নারদ, ধনন্তরি, অঙ্গীরস, কপিল কন্ডরাগ্নিশাম, অতুল, পূর্ব কাত্যায়ন ইত্যাদি। মিলিন্দ প্রশ্নে আরও উল্লেখ আছে এই সকল আচার্যগণ এক সময়ে রোগোৎপত্তি, উহার নিদান, রোগের স্বভাব, রোগোপশম, চিকিৎসা, ঔষধের ত্রিবিধা, সাফল্য এবং অসাফল্য সমস্ত নিঃশেষে জানতেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে জীবকের জীবন বৃত্তান্ত যেভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে, তাহাতে আমরা প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক তথ্য পাই। তাই এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে জীবকের জীবনী বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হচ্ছে।

মগধরাজ শ্রেনিক বিম্বিসারের পুত্র রাজকুমার অভয় রাজকুমার অন্তঃপুরে এক আবর্জনা স্তূপে এক জীবন্ত শিশুকে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় উদ্ধার করেন। তিনি শিশু জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেন বলে শিশু নাম রাখলেন জীবক। তাছাড়া অভয় রাজকুমার কর্তৃক প্রতিপালিত বলে জীবকেকে “কৌমার ভৃত্য” নামে অভিহিত হয়। কৌমার ভৃত্যজীবক অভয় রাজ কুমারের তত্ত্বাবধানে রাজ অন্তঃপুরে লালিত পালিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে জীবক বিশেষ বিজ্ঞ চিন্তা প্রাপ্তির পরিচয় দিতে থাকেন। জীবক চিন্তা করলেন যে রাজকুলে অবস্থান করতে হলে তাঁকে কোন শিল্প বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তিনি চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য অভয় রাজকুমার অনুমতি নিয়ে তক্ষশিলায় এক বৈদ্যের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁর নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা শুরু করেন। কৌমারতত্ত্বজীবক ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। তিনি অতি অল্প সময়ে অধিগত বিষয় স্মরণ রাখতে পারবেন এবং সম্যকভাবে ধারণ করতে পারতেন। কিন্তু সাত বৎসর ধরে অধ্যয়ন করার পরও চিকিৎসা বিদ্যার শেষ দেখতে পারছিলেন না। অতঃপর তিনি একদিন তার আচার্যের নিকট উপনীত হয়ে আচার্যকে বল্লেন-“আচার্য-আমি অধিক পাঠ গ্রহণ করতেছি, শীঘ্র অর্থবোধ করতেছি। সম্যকভাবে ধারণ করতেছি এবং অধিগত বিষয় স্মরণ রাখতে সমর্থ হচ্ছি। কিন্তু সাত বৎসর অধ্যয়ন করেও এই বিদ্যার অবসান হচ্ছে না। কখন-এই বিদ্যার অন্ত পরিদৃষ্ট হবে?” আচার্য বলেন-“ভগে” জীবক, তাই হলে তুমি খনিজ লয়ে তক্ষশিলায় চতুর্দিকে যোজন পরিমিত স্থানে বিচরণ করে ভৈষজ্যের অনুপযোগী যাহা দেখতে পারে তাহা নিয়ে আস।” জীবক তাঁর আচার্যের নির্দেশমত তক্ষশিলায় যোজন পরিমিত স্থানে বিচরন করে ভৈষজ্যের অনুপযোগী কোন দ্রব্য দেখতে পেলেন না। তিনি তাঁর আচার্যকে এই কথা জানালেন। আচার্য বল্লেন-

ভণে” জীবক, তুমি শিক্ষিত হয়েছ, তোমার জীবিকা নির্বাহের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।” জীবক তাঁর আচার্য হতে চিকিৎসক হিসাবে ছাড়পত্র নিয়ে রাজগৃহের পথে যাত্রা করেন। এখানে জীবকের চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচিত কয়েকটা উদাহরণ উপস্থাপন করা হচ্ছেঃ-

১। জীবক সাকেতে একজন শ্রেষ্ঠীয় পত্নীয় সাত বৎসরের শিররোগের চিকিৎসা করেন। তিনি গন্ডুষ পরিমান চর্বি বিবিধ ভৈষজ্যে সংযোগে পাক করে রোগীর নাসিকায় প্রয়োগ করে মুখ দিয়ে নিঃসরণ করতে বলেন। জীবক শ্রেষ্ঠী পত্নীর সাত বৎসরের শিররোগ একমাত্র নস্য প্রয়োগে উপশম করেন।

২। এক সময় মগধরাজ শ্রেনিক বিশ্বিসারের ভগন্দর রোগ হয়েছিল। জীবক মগধিরাজ শ্রেনিক বিশ্বিসারের ভগন্দর রোগ একবার মাত্র প্রলেপ দানে বিদূরিত করেন।

৩। জীবক রাজগৃহের জনৈক শ্রেষ্ঠীয় সাত বৎসরের শির রোগ অস্ত্রোপাচার করে চিকিৎসা করেন। জীবক রাজগৃহের শ্রেষ্ঠীকে মঞ্চ শয়ন করায় মঞ্চের সহিত দৃড়ভাবে বন্ধন করেন। তারপর তিনি মস্তকের চামড়া উৎপাটিত করে করোটি অস্থি খুলে মস্তক থেকে দুইটি কীট বের করেন। তারপর করোটি যথাযথ ভাবে সংস্থাপন করে মস্তকের চর্ম সেলাই করে প্রলেপ প্রদান করেন। শ্রেষ্ঠীকে তিন সপ্তাহ তিন অবস্থায় শয়ন করায় শ্রেষ্ঠীকে সুস্থ করে তোলেন।

৪। সেই সব বারাণসী শ্রেষ্ঠী পুত্রের অল্পগণ্ড রোগের (হাতুড়ী পঁচের যাওয়া) উৎপত্তি হয়েছিল। জীবক শ্রেষ্ঠীপুত্রকে একটা স্তম্ভে দৃড়ভাবে বন্ধন করে তার উদরের চর্ম উৎপাদিত অল্পগ্রস্থি বের করেন। তারপর অল্পগ্রস্থি পরিষ্কার করে অল্পগুলি উদরের ভিতর প্রবেশ করায় সঠিক ভাবে স্থাপন করেন। তারপর উদরের বিভিন্ন স্তর সেলাই করে চর্ম সেলাই করেন এবং চামড়ায় উপর প্রলেপ দেন। কিছু দিনের মধ্যে বারাণসী শ্রেষ্ঠী পুত্র সুস্থ হয়ে উঠেন।

৫। এক সময়ে উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোতের পাদু রোগ হয়েছিল। জীবক চর্বি জাতীয় ভৈষজ্য প্রয়োগ করে রাজা প্রদ্যোতের অসুখ চিকিৎসা করবে মনস্থ করেন। এদিকে রাজা প্রদ্যোত চর্বি জাতীয় ভৈষজ্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই জীবক বিবিধ ভৈষজ্য প্রয়োগ করে চর্বি, বর্ণ কষাটে, গন্ধ কষাটে ও স্বাদ কষাটে করে নিলেন এবং প্রদ্যোতকে খেতে দিলেন। তাতে রাজা প্রদ্যোত আরোগ্য লাভ করেছিলেন।

৬। জীবক রাজা প্রদ্যোতের কাক নামক দাসকে আমলকীয় সহিত ভৈষজ্য মিশ্রিত করে বিরেচন (দান্ত) সৃষ্টি করেছিলেন।

৭। এক সময়ে বুদ্ধ শরীরের পিত্তাধিক্য হেতু শরীর দোষ গ্রস্থ হয়েছিল। জীবক বুদ্ধকে তিন দণ্ডযুক্ত উৎপলের বিবিধ ভৈষজ্য প্রয়োগ ঘ্রান দিতে বলেন। বুদ্ধ তিন উৎপলের তিন ঘ্রান নিয়ে ত্রিশবার বিরেচন করে আরোগ্য লাভ করেন।

৮। বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষুদের জীবক যথাসাধ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা করতেন। তখন মর্গধে পাঁচ প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। যথা (১) কুষ্ঠ, (২) গণ্ড (ফোড়া) (৩) কিলাস (চর্মরোগ) (৪) ক্ষয়রোগ ও (৫) অপস্মার। জীবক ভিক্ষুদের এইসব রোগের চিকিৎসা করে তাদের রোগাপশম করতেন।

৯। এক সময় দেবদত্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে বুদ্ধের পাদ হতে রক্তপাত হয়েছিল। জীবক বুদ্ধের পাদে প্রলেপ প্রয়োগ করি বুদ্ধের রোগের চিকিৎসা করে তাঁকে রোগমুক্ত করেন।



নিঘণ্ট:

শব্দ	পৃষ্ঠা	শব্দ	পৃষ্ঠা
অগগৎঃঃ সূত্র	২১, ২২	ঘণ	২৫, ২৬
অঙ্গীরস	৩৯	চরক	২
অঙ্গুত্তর নিকায়	৩৩	চুন্মবর্গ	৩৩
অতুল	৩৯	জাতক	৩৫
অনাথপিণ্ডিন	৩১, ৩৬	জিনপঞ্জর গাথা	৩৫
অভয়রাজ কুমার	৩৯	জৈতবন	৩৬
অভিগহ প্রত্যবেক্ষণ	১	জীবক	৩৮, ৩৯
অভিধর্ম	৫	তক্ষশিলা	৩৯
অর্বুদ	২৫, ২৬	দীঘ নিকায়	২০
অসংজ্ঞ সত্ত্ব	২৩	দশসংজ্ঞা	৩১
আকাশ গোত্রবৈদ্য	৩৮, ৩৯	দেবদত্ত	৪১
আঙ্গুলিমাল	৩৫	ধম্মপদ	৩, ৪
আনন্দ	৩১, ৩২, ৩৩	ধন্বন্তরী	৩৯
আভাস্বর জগৎ	২১	নামরূপ	১
আয়ুর্বেদ	৩৫	নারদ	৩৯
আলবী রাজ্য	৪	নির্দেশ	২৫, ৩৪
ইন্দ্রকুট পর্বত	২৪	পরমার্থ সত্য	১, ৪
উজ্জয়িনী	৪০	পরমথ জ্যোতিকা	১৯
উদ্যান	২	পসাথ	২৬
একত্রিংশ ভূবন	২৩	পূর্বকাত্যায়ন	৩৯
কন্তুরাগ্নিশাম	৩৯	পেশী	২৫
কপিল	৩৯	পৌরুষবাদ	২
কল্ল	২৫	প্রজ্ঞাবংশ ভাবনা কেন্দ্র	১
কাকদাস	৪০	প্রবর্তন কাল	২৩
কামসত্ত্ব	২৩	প্রতিসন্ধিকাল	২৩
কায়গতান্ধ্রতি	৬, ৭	প্রদ্যোত	৪০
কায় বিজ্ঞান	২৫, ২৬	বারানসী	৪০
কুমার প্রশ্ন	৪	বিতর্ক চরিত	১৩
কোষ্টাস	৭	বিদর্শন ভাবনা	৬
ক্ষত্রিয়	২২	বিনয় পিটক	২৬, ৩৮
খুদ্ধক নিকায়	৪	বিহিসার	৩৯, ৪০
খুদ্ধক পাঠ	৬	বিশুদ্ধিমার্গ	৬, ২৫
গিরিমানন্দ	২৬, ৩৩, ৩৫	বুদ্ধি চরিত	২৩

শব্দ	পৃষ্ঠা	শব্দ	পৃষ্ঠা
বৈশ্য	২৩	রাগচরিত	১৩
বোয়ালখালী	১	রাজগৃহ	২৪
ব্রাহ্মণ	২৩	রূপ সত্ত্ব	২৩
ব্রাহ্মণ ধর্মিয় সুত্ত	২৩	লক্ষণ রূপ	২৪
ভূমি পর্পট	২২	শমথ	৬
ভ্রণতত্ত্ব	২৫	শাকপুরা	১
মঙ্গল	৩৯, ৪০	শারদীয় রোগ	৩৬
মধ্যমনিকায়	২৪	শারীপুত্র	৩৫
মনোধাতু	১৩	শূদ্র	২৩
মনোবিজ্ঞান ধাতু	১৩	শ্রদ্ধা চরিত	১৩
মহাবর্গ	৩৩, ৩৬, ৩৯	শ্রাবস্তী	৪, ৩১, ৩৬
মহাসম্মত	২২	সূত্রনিপাত	২৩
মহাসতি পট্টান	৬	স্রোতাপত্তি	৪
মহাসীহনাদ যুক্ত	২৪	সংযুক্ত নিকায়	৬, ২৪, ২৫, ২৬, ৩৩
মিলিন্দ প্রশ্ন	৩৪, ৩৫, ৩৯	সত্য ক্রিয়া	৩৬
মোগ্গালায়ন	৩৫	সম্মতি সত্য	১, ৪
মোহ চরিত	১৩	সাক্ষেত	৪০
যোগবাশিষ্ঠ	২	সালি তদ্ভুল	২২
রস মৃত্তিকা	২১		



সহায়ক গ্রন্থাবলী

- | | | |
|-----|--------------------|--|
| ১। | বিশুদ্ধিমার্গ | শ্রী গোপাল দাশ চৌধুরী ও শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী,
১৩৩০ বাংলা |
| ২। | মহাবর্গ | শ্রী প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ১৩৩৭ বাংলা |
| ৩। | মধ্যম নিকায় | শ্রী বেণীমাধব বড়ুয়া, ১৯৪০ ইং |
| ৪। | সুত্ত নিপাত | শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির, ১৯৮৭ ইং |
| ৫। | কায় বিজ্ঞান | শ্রীমৎ ধর্মতিলক স্থবির, ১৯৩৫ ইং |
| ৬। | ধম্মপদ | শ্রী গিরিশ চন্দ্র বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ ইং |
| ৭। | সদ্ধর্ম রত্নবৈভ্য | শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির, ১৯৬৯ ইং |
| ৮। | মিলিন্দ প্রশ্ন | শ্রীমৎ ধর্মাধীর মহাস্থবির |
| ৯। | অভিধম্মার্থ সংগ্রহ | শ্রী বীরেন্দ্র লাল মৃৎসুদী, ১৯৪০ ইং |
| ১০। | দীঘ নিকায় | ভিক্ষু শীলভদ্র, ১৩৫৩ বাংলা |

1. **Medical Science in Pali literature** -J. R Haldar, 1977
2. **The Book of Gradual Sayings**
(Anguttar Nikaya) vol-v by F.L. Wood ward-1932
3. **The Path of Purity**
(Visuddhimagga) Pe Maung Tin, Pali Text Society. 1975.
4. **Dhamma pada-Sri Achariga Buddha Raskita.**
5. **The Khuddaka Patha Paramattha Jotika-1,**
Helmur Smith. Pali Texty Society, 1978.
6. **The Minor Reading** The Illustration of the ultimate Meaning
(Khuddhaka Patha & Paramattha Jotika-by Bhikkhu Part-1,
Nanamoli. Pali Text Society, 1978.
7. **The Book of the Kindred Sayings** (Sangutta Nikaya)
by F.L Woodward, Pali Text society, 1975



ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, এম, বি, বি, এস; এফ, সি, পি, এস, (সার্জারী) ৭ই মে, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার অন্তর্গত রাউজান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াত নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া রাউজান আর্থ-মৈত্রেয় উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘ দিন ধরে শিক্ষকতায় নিয়োজিত থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর মাতার নাম নীলিমা বড়ুয়া। ডাঃ বড়ুয়া রাউজান আর্থ-মৈত্রেয় প্রাইমারী ও উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে পালিতে কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিকুলেশন এবং চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ হতে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে আই, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হতে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে এম, বি, বি, এস, পাশ করেন। ঢাকার পোষ্ট গ্রেজুয়েট ইনস্টিটিউটে লেখাপড়া করে তিনি ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে “বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান এবং সার্জন” এর ফেলো হন। ডাঃ বড়ুয়া শৈশব হতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য বিশেষ আগ্রহী। উল্লেখ্য তিনি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃত ও পালি বোর্ড হতে পালিতে আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি একজন শৈল্য চিকিৎসক হয়েও এবং অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা গবেষণা করে যাচ্ছেন। বৌদ্ধদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তিনি নিবেদিত প্রাণ। এই পর্যন্ত তিনি “নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া পরিচিতি”, “চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের ইতিহাস”, “সরণং গচ্ছামি”, “ডঃ বেণী মাধব বড়ুয়ার জীবন দর্শন”, “দশ পারমী ও চরিয়া পিটক”, “ধাতুকথা”, (সানুবাদ), “দুই হাজার সালে বৌদ্ধধর্ম”, “শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির”, “আর্থ-মৈত্রেয় বুদ্ধ” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছেন। তাহাছাড়া তিনি রাউজানে ভিক্ষুসংঘ আয়োজিত পরিবাস উপলক্ষে প্রকাশিত “পরিবাস” সম্পাদনা ও “সাসন সেবক সংঘ” নামক সংগঠনের পক্ষে “প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা ও খুদ্ধকপাঠ” গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ডাঃ বড়ুয়ার প্রায় দশটি মৌলিক, তথ্যভিত্তিক এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বিভিন্ন স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে।